আব্দুল আজিজ-বিন-সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক

Ph.D.

পি, এইচ, ডি, থিসিস

আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

জুলাই, ১৯৯৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ,ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

382375
Dhaka University Library
382375

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আব্দুল আজিজ-বিন-সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ পি,আই,এস, মুস্তাফিজুর রহমান
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ১৯৯৭

382375

আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে 'আব্দুল আজিজ-বিন-সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং ইহা পি-এইচ,ডি ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য।

(ডঃ পি, আই, এস, মুস্তাফিজুর রহমান)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

382375

ঢাকা
বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রত্যয়ন পত্র

মুখবন্ধ .... ক-গ

ভূমিকা ১-১০

প্রথম অধ্যায় ঃ ইবনে সউদের অভ্যুদয়

১। ইবনে সউদের উৎপত্তি

২। অভ্যুদয়

৩। ক্ষমতা দখল

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইখওয়ানের উৎপত্তি

১। ইখওয়ানের পরিচয় ৩৫-৩৮

২। ইখওয়ান নামের উৎপত্তি ৩৯-৪০

৩। ইখওয়ানের উদ্দেশ্য ৪১-৪১

৪। ইখওয়ানের নীতিমালা ৪২-৪২

৫। ইখওয়ানের সংগঠন ৪৩-৫১

৬। ইখওয়ানের সামরিক বৈশিষ্ট্য ৫২-৫৫

৭। ইখওয়ান সম্প্রসারণ ৫৬-৫৬

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইবনে সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের ও ওয়াহাবীগণের সম্পর্ক ৬৩-৬৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

ক) ইখওয়ানের সামরিক কার্যক্রম

১। যুদ্ধ তৎপরতা ৭২-১০২

Dhaka University Institutional Repository

খ) ইখয়ানের বেসামরিক কার্যক্রম

১। ধর্মীয় কার্যাবলী..১০৩-১০৩

২। সামাজিক সংস্কার......................................১০৪-১০৪

৩। কৃষি কাজ...১০৪-১০৪

৪। ইখওয়ানের পোষাক, আচরণ ও খাদ্যাভাস........১০৫-১০৫

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইখওয়ান বিদ্রোহ..১১৫-১৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইখওয়ানের পরিণতি..১৪১-১৫৫

সপ্তম অধ্যায় ঃ ইখওয়ানের অবদান.....................................১৫৮-১৬৪

উপসংহার ১৬৬-১৭১

গ্রন্থপঞ্জী ১৭২-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

"আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ এর সঙ্গে ইখওয়ানের সমপর্ক" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আমি এই মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণা কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি আমাকে তাঁর পান্ডিত্যের দ্বারা যে সাহায্য এবং সহযোগিতা দান করেছেন তার ফলেই আমার অভিসন্দর্ভ বর্তমান রূপ পেয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সুফিয়া আহমেদ আমার একাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ঝালকাঠী সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা বিভাগীয় প্রধান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর প্রফেসর আব্দুস সালাম প্রশাসনিক সাহায়তা ও দ্রুত গবেষণা সম্পন্ন করার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ ও আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। ঝালকাঠী সরকারী কলেজের সহকর্মীবৃন্দ বিশেষভাবে ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আমার গবেষণা কাজে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। গজারিয়া সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হুসাইন খান ভাষান্তরের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তাঁর কাছেও আমি ঋণী।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মরহুম প্রফেসর ডঃ আলী আসগর খান আমাকে বিভিন্ন সময়ে এই গবেষণার কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর আত্মার আমি মাগফেরাত কামনা করি।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্তৃপক্ষ পি.এইচ.ডি. গবেষণার জন্য ফেলোশীপ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভারতের আলীগড়ের মাওলানা আজাদ লাইব্রেরী এবং সেন্টার অফ ওয়েষ্ট এশিয়ান ষ্টাডিজ, দারুল উলুম দেওবান্দ গ্রন্থাগার, দিল্লী জামেয়া-ই-মিল্লিয়া গ্রন্থাগার, দিল্লী নেহেরু ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার, দিল্লী ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী সমূহে গিয়েছি এবং তথ্য সংগ্রহ করেছি। পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আজম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব পাকিস্তান এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোরে ও সশরীরে তথ্য অনুসন্ধান করেছি। উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীবৃন্দ আমাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দিল্লী ও ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাই-কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সেখানে অবস্থান কালে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশে অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, আমেরিকান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য দান করেছেন। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত সউদী দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, অফিসার্স, কর্মচারীবৃন্দ এবং সউদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা ও পত্রালাপে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তারা বহু অজানা তথ্য আমাকে পরিবেশন করেছেন। যার ফলে আমার থিসিস সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগারে সার্বক্ষণিক কাজ করতে হয়েছে। সেখানকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আমাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তজ্জন্য তাঁদেরকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গবেষণা কাজের জন্য ডেপুটেশন মঞ্জুর করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

ইতিহাসে প্রাপ্য উপকরণের বস্তুনিষ্ঠতা নির্ণীত হয়। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্থান এখানে নেই। তাই Historical Methodology বা ইতিহাসের নিরীক্ষা তত্ত্ব প্রয়োগ করে এ অভিসন্দর্ভে বিষয়বস্তুর পরিবেশন, বিন্যাস, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ও ধারা উপস্থাপিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে যদি কিছু গুণাবলী থাকে তা বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পন্ডিত পরীক্ষকগণের বিবেচ্য। এর মধ্যে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তার জন্য একমাত্র আমি নিজেই দায়ী।

আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বক্ষমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু হচ্ছে আব্দুল আজিজ বিন সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক। আরবের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি প্রবল শক্তি হিসেবে ইখওয়ানের উদ্ভব এবং সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইখওয়ানের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সউদী রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং ইখওয়ানের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও পতনের ইতিহাস সম্পর্কে এযাবত বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আহমদ আব্দুল গফফুর কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'ছাকরুল জাযীরা' গ্রন্থে আরবে ওয়াহাবী আন্দোলন ও সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই ইখওয়ানের ভূমিকা আলোচনায় এসেছে। যিরিকলী প্রণীত 'আলাম' গ্রন্থে রয়েছে সউদী শাসনের উদ্ভব ও তাদের জীবন বৃত্তান্ত। এই গ্রন্থে ইখওয়ান সম্পর্কে মাত্র একটি অধ্যায় রয়েছে। শেখ মুহাম্মদ হায়াত কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'তারীখে সউদী আরব' গ্রন্থে রয়েছে সউদী রাজ্যের ইতিহাস ও রাজন্যবর্গের বিবরণ। ইখওয়ান সম্পর্কে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই এ গ্রন্থে স্থান পায় নি।

পরবর্তী পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে রবার্ট লেসির 'The Kingdom' গ্রন্থে সউদী রাজ্যের অভ্যুদয় ও এর ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে আধুনিক সউদী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদই আলোচনায় সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এখানেও ইখওয়ানের ভূমিকা গৌণ। সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকার তেমন মূল্যায়ন করা হয়নি। জন.এস. হাবিব তাঁর 'Ibn Saud's Warriors of Islam' গ্রন্থে ইখওয়ান আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, ইখওয়ানের বিদ্রোহ ও পতন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক সউদী রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা এবং আরবদের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ইখওয়ান আন্দোলনের অবদান ও প্রভাবের মূল্যায়ন করা হয়নি। মুহাম্মদ আলমানা তাঁর 'Arabia Unified' পুস্তকে ইবনে সউদ কর্তৃক আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার, ইখওয়ানের অভ্যুদয়, বিদ্রোহ এবং পতন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

হাফেজ ওয়াহাবা, আমীন রিহানী, মুহাম্মদ জালাল কস্ক, মুহাম্মদ আসাদ, আব্দুল ফাত্তাহ হাসান, আবু আলীয়া এইচ,আর,পি, ডিকসন, ফিলবী, হাওয়ার্থ ডেভিড প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনায় ইবনে সউদ ও ইখওয়ান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার মূল প্রতিপাদ্য হলো ইখওয়ান। এখানে আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে ইখওয়ানের উদ্ভব, তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শন, তাদের ব্যতিক্রমধর্মী জীবন ধারা, সামরিক শক্তি হিসেবে তাদের উত্থান, রণকৌশল ও রণনৈপূণ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরবের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে ইখওয়ানের অভ্যুদয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আব্দুল আজিজ এই শক্তিকে সুসংহত করেন। অপর পক্ষে ইখওয়ান আধুনিক সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

আরবদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ইখওয়ানের মতবাদ ও আদর্শ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এ যাবত রচিত গ্রন্থাবলীতে সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ইবনে সউদের সাফল্য, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সউদী রাজবংশের শাসনের বিবরণ ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত আলোচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের লেখদের মূল লক্ষ্য আধুনিক সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ সউদী রাজ্যের ইতিহাস এবং আব্দুল আজিজ বিন সউদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন। ইখওয়ানের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আব্দুল আজিজ কিভাবে আরব উপদ্বীপে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে বিষয়টিই এসব আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ এর সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে ইখওয়ান সম্পর্কে বর্তমান ঐতিহাসিক বিবরণের অপ্রতুলতা বা অপূর্ণতাকে পূরণ করার প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনায় এককভাবে আব্দুল আজিজ বা ইখওয়ান কোন উপাদানই প্রাধান্য পায়নি। আলোচনার প্রধান বিষয় হচ্ছে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ সংগঠিত ও শক্তিশালী ইখওয়ান সংগঠন এবং তাঁর সঙ্গে ইখওয়ানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইখওয়ান এবং আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ এর সম্মিলিত শক্তি ব্যতিরেকে আধুনিক সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। তাই ইবনে সউদের সঙ্গে ইখওয়ানে সম্পর্ক এই অভিসন্দর্ভে মূখ্য বিষয় বিবেচিত হয়েছে।

সউদী আরব রাজ্য আরব উপদ্বীপের হেজাজ, নজদ এবং আসীর ভূখন্ডে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে জর্দান, ইরাক ও কুয়েত এবং দক্ষিণে ওমান ও ইয়ামেন। পূর্বে আরব সাগর, বাহরাইন, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর।(১) সমগ্র আরব উপদ্বীপের মোট আয়তনের শতকরা ৮০ ভাগ জুড়ে সউদী আরব রাজ্য অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার।(২) সউদী আরবের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। এদেশে আছে উর্বর সমভূমি, প্রস্তরময় মালভূমি, উপত্যকা, উঁচু পাহাড় এবং বিশাল মরুভূমি। এই বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার বিভাজন অসম।

আরবদেশের বিচিত্র ভৌগলিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অধিবাসীদের দেহ, মন, চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও জীবন যাত্রার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। শুষ্ক জলবায়ু, নদ-নদীর অভাব, বিরল বৃষ্টিপাতের দরুণ আরবে খাদ্য-শস্য ও জীবন ধারণের অন্যান্য জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য ছিল। সেজন্য তাদেরকে জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে হত। তাই নির্মম প্রকৃতির প্রভাবে তারা ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়েছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু ও প্রচন্ড সাইমুম ঝড়, উন্মত্ত লু হাওয়া এবং রুক্ষ পাহাড়-পর্বত তাদেরকে বলিষ্ঠ ও কর্মদক্ষ করেছে। যেহেতু একস্থানে সারা বছরে খাদ্যের

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থান এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্য ছিল না। তাই খাদ্য পানি এবং বাস উপযোগী স্থানের সন্ধানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম সফর করতে হয়েছে। বেদুঈনরা যেহেতু একস্থানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না, তাই পশু পালন এবং পশু চারণ তাদের একমাত্র পেশা ছিল। তারা মরুদ্যান ও তৃণভূমিতে তাদের গবাদি ও পরিবারবর্গকে নিয়ে তাঁবুতে অস্থায়ীভাবে বাস করত। এই জন্য তাদেরকে যাযাবর বা বেদুঈন বলা হয়।

প্রতিকূল পরিবেশে আরবদের গোত্রীয় এবং রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গোত্রীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল। আরবদেশের ভৌগলিক সীমানায় কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না বলে জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। একখন্ড উর্বর ভূমি ও তৃণক্ষেত্র দখলের জন্য ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হত। স্থায়ী অধিবাসী ও মরুচারীরা পারস্পরিক আক্রমণের আশংকায় সদাসর্বদা সজাগ ও সন্ত্রস্ত থাকত। কাজেই নিরাপত্তার গরজেই তারা গোত্রবদ্ধ হয়ে গোত্রীয় দলপতি শেখের নেতৃত্বাধীনে বসবাস করত। বেদুঈনদের দেশপ্রেম বলতে তাদের গোত্রপ্রীতিই বুঝাত। এরূপ গোত্রে গোত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাসের ফলে আরবদের মধ্যে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গোত্রীয় ব্যবস্থার জন্যই প্রাক-ইসলামী যুগে বংশানুক্রমিক লড়াই বিবাদ লেগে থাকত। তারা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষায় পারদর্শী ছিল। প্রকৃতির প্রভাবে আরবগণ স্বাধীনচেতা হয়েছে। আরবের রুক্ষ ও বিরূপ ভূ-প্রকৃতি দেশটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে আবদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বাধীনতাবোধ খুব প্রকট হয়েছে। গোত্রীয় সম্মান, সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করত না। বেদুঈন ব্যতীত আরবদেশে স্বল্প সংখ্যক কিছু স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। যারা শহরে বাস করতেন তারা ছিলেন ব্যবসায়ী। উর্বর মরুদ্যান অঞ্চলে বাস করতেন কৃষিজীবি।

আরব বণিকগণ পারস্য, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আবিসিনিয়া এমন কি চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ও বাণিজ্যি যোগাযোগ রক্ষা করত। অনুর্বর আরবদেশের প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন না হওয়ায় আরবগণ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করত। তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে কেন্দ্র স্থানীয় ছিল। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে আরবদেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বাণিজ্য পথের যোগসূত্র ছিল।

উসমানীয় সুলতান প্রথম সেলিমের শাসনকালে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপ তুর্কী শাসনাধীনে চলে যায়। মধ্য আরবের নজদ অঞ্চল তখনও স্বাধীন ছিল। আরবদেশ উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও আরব ভূ-খন্ডের নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতিয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদিকে উসমানীয় তুর্কীদের আগ্রাসন অন্যদিকে আরবদের মধ্যকার অনৈক্যের ফলে আরব উপদ্বীপ খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

নজদে ওয়াহাবী মতবাদের অনুসারী সউদ বংশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীন হেজাজে মক্কার শরীফ বংশের প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল।(৩)

আরবের উত্তরাংশ হাইল উসমানীয় সাম্রাজ্যের আশ্রিত রাজ্য ছিল।(৪)

লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত আসির ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এই অঞ্চলে তুর্কী আশ্রিত ইদ্রিসী বংশীয়রা রাজত্ব করতেন।(৫)

জায়েদী ইমাম শাসিত ইয়ামেন ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ ছিল।

উপসাগরীয় এলাকার বিভিন্ন সুলতান ও শেখ বৃটেনের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল।(৬)

পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অবস্থিত হাসা অঞ্চল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

হেজায, হাইল, আসির, ইয়ামেন, হাসা প্রভৃতি অঞ্চলকে বৃটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উসমানীয় শাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

১১৫৭ হিজরী ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পিতা সউদের মৃতুর পর মুহাম্মদ ইবনে সউদের

Dhaka University Institutional Repository

সজদের যুবরাজ এবং দারিয়ার আমীরাত লাভ করেন। মুহাম্মদ উবনে সউদ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন এবং উহার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব নেন। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ইবনে সউদের বংশধরগণ ওয়হাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের পূর্বে সউদী রাজবংশের ১৮ জন পরপর দারিয়া ও নজদের আমীরাত শাসন করেন। দারিয়ায় মুহাম্মদ বিন সউদ মুকরিন গোত্রভুক্ত ছিল। দারিয়ার নিকটবর্তী রিয়াদে দোয়াশীর আলাদা রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। নজদের ছোট এলাকাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।(৭) নজদের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বিবাদ এবং নৈতিক অধঃপতন চরম আকার ধারণ করে। নজদের উত্তরকোণে জাবালে শামনার অঞ্চলে তাঈ গোত্রের এবং হাসা অঞ্চলে খালেদ বংশের প্রতাপ ছিল।

নজদের বেদুঈনরা সনাতন ইসলামের পথ ছেড়ে অসংখ্য কুসংস্কারপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান যেমন গাছ ও পাথর পূজায় লিপ্ত হয়। তারা শরীয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোত্রীয় এবং প্রথা ভিত্তিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর চড়াও হত। এক গ্রাম অন্য গ্রামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত। কোন কোন বেদুঈন ব্যবসায়ী কাফেলার মালামাল লুট করত। কখনো কখনো বেদুঈনরা মক্কাগামী হজ্জ যাত্রীদের উপর আক্রমণ চালাত। চৌর্যবৃত্তি এবং রাহাজানির মাধ্যমেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

হাম্বলী মতাবলম্বী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামের পথে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন গড়ে তোলেন। মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং তাঁর অনুসারীরা উক্ত আন্দোলন সমস্ত আরব উপদ্বীপে প্রচার করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন নজদবাসীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।

পরবর্তীকালে তারা ওয়াহাবী নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে মুওয়াহেদুন ও আহলুত তাওহীদ বলে আখ্যায়িত করত। এই বিশৃংখল অবস্থায় ইসলামের মৌলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ৭ই জিলক্কাদ ১২৩৩ হিজরী ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দারিয়া প্রথম সউদী আমীরাতের পতন ঘটে। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তারা রিয়াদে

Dhaka University Institutional Repository

সংঘবদ্ধ হন।

শাবান ১২৩৪ হিজরী জুন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াহাবী রাজধানী আদ-দারিয়ার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মিসরীয়দের ওয়াহাবী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সফল হয়। ফলে ওয়াহাবীদের পতন হয়। সউদী পরিবারের অনেক সদস্যকে হত্যা অথবা নির্বাসিত করা হয়। তাদের আবাসভূমি পুড়িয়ে ফেলা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত দারিয়া শহর বিধ্বস্ত হয়। এভাবে নজদের কেন্দ্রীয় শক্তির পতন ঘটে। পুনরায় নজদ বিবদমান গোত্র ও গ্রামে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ আলী এবং ইব্রাহীম পাশার আরব ত্যাগ করার পর সউদী উত্তরসূরীগণ পুনরায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। ওয়াহাবী আমীরাতের রাজধানী দারিয়া ধ্বংসের সময় তুর্কী নামে আব্দুল্লাহর একজন পিতৃব্যপুত্র রিয়াদে আত্মগোপন করেন। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। আরবে দ্বিতীয়বারের মত সউদী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠায় তুর্কী মূখ্য ভূমকা পালন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। তাঁর পুত্র ফয়সল রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ আলী পাশা পুনরায় নজদ অভিযান চালিয়ে আমীর ফয়সলকে বন্দী করেন। তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে বন্দী জীবন যাপন করেন। পরে তিনি কৌশলে পালিয়ে রিয়াদ যান। রিয়াদে তিনি সউদী রাজবংশের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাইলের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে রশীদের সহায়তায় মিসরীয়দের নজদ হতে তাড়িয়ে দেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর ইনতেকালের পর নজদের ওয়াহাবী মতাবলম্বী শাসকগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হাইল এবং রিয়াদের আমীরাতদ্বয়কে কেন্দ্র করে বহুদিন ব্যাপী সংঘর্ষ চলে।(৮) আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ ইখওয়ান সংগঠনের সহায়তায় বিচ্ছিন্ন আরবগোত্রকে একটি আদর্শের ভিত্তিতে একত্রিত করেন। ইখওয়ান ও তাঁর সম্মিলিত শক্তিকে সামরিকভাবে দক্ষ এবং সুসজ্জিত বাহিনীতে পরিণত করেন। ইখওয়ান তাঁরই সৃষ্টি। একটি আন্দোলন এবং সংগঠন হিসেবে আরবে ইখওয়নের আবির্ভাব আব্দুল আজিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না।

ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ইবনে সউদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রচন্ড

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিরূপে ইখওয়ানের কার্য্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়নি। ইখওয়ানের মত একটি শক্তিশালী সংগঠন ব্যতিরেকে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের পক্ষে একটি আধুনিক স্বার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। ইবনে সউদ ছাড়া ইখওয়ানেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই অভিসন্দর্ভে দেখানো হয়েছে যে, ইখওয়ানের আন্দোলন এবং সংগঠন যেমন আব্দুল আজিজের প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বের পর তেমনি সংগঠিত ইখওয়ানের সামরিক ও সামাজিক শক্তির উপরে সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কতটা নির্ভরশীল ছিল। এখানে আব্দুল আজিজ এবং ইখওয়ান উভয় উভয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে সফল হয়েছে।

আব্দুল আজিজ এবং ইখওয়ানের মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য ও তার ফলে সামরিক দ্বন্দ্ব যা প্রায় গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হয় তার কারণ এবং ফলাফল এই অভিসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, আব্দুল আজিজ এবং ইখওয়ান অবিচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায় পৌছে। কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় তখনই তারা দুর্ভাগ্যজনক এবং সংকটাপন্ন পরিণতির সম্মুখীন হয়। উভয়েরই অস্তিত্ব তখন বিপন্ন। এই সংকট এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিণতি শেষ পর্যন্ত ইখওয়ানের সামরিক এবং রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্তি এবং আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের উত্তরণ ঘটে। রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসেবে ইখওয়ানের বিলুপ্তির পরেও তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রভাবের রেশ কিভাবে আধুনিক সউদী রাষ্ট্রে এখনও যে বিদ্যমান তার ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের অভ্যুদয় সউদী রাজবংশের পর্যায়ক্রমে ১৮ জন আমীরের শাসনকাল সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতয়ি অধ্যায় ইখওয়ানে উৎপত্তি, উদ্দেশ্যে, নীতিমালা, সংগঠন সামরিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের ও

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহাবীগণের সম্পর্কের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ইখওয়ানের সামরিক কার্যক্রম এবং বিজয় অভিযান সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে।

এখানে ইখওয়ানের সামরিক, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং তাদের কৃষিকার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের পোষাক আচার আচরণ ও খাদ্যাভাস আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে যে ইখওয়ানের সহায়তায় আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ সমগ্র নজদ এবং হেজাজে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন তাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণ ঘটনাবলী ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ইখওয়ান এবং ইবনে সউদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা এবং পরিণতি কি হয়েছিল তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। সউদের মহানুভবতার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় আধুনিক সউদী আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইখওয়ানের অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Information, This is our country, 1993, P.3.

২। The Bangladesh Observer, Special Supplement, Monday, September 23. 1996.

৩। হাফেজ ওয়াহবাহ, জাযীরাতিল আরব ফীল করনিল ইশরীন, মিসর, ১৩৮৭ হি; পৃঃ ১৪।

(حافظ وهبه - جزيرة العرب في قرن العشرين : القاهرة ١٣٨٧ه ص/١٤)

৪। আমীন রিহানী, নজদ ওয়া মুলহাকাতুহ, বৈরুত; ১৯৬৪, পৃঃ ১৫৪।

(امين الريحاني-نجد ملحقاته- بيروت: ١٩٦٤م ص١٥٤

৫। আব্দুল ফাত্তাহ হাসান আবু আলীয়া, আল-ইছলাহুল ইজতেমায়ী, রিয়াদ, ১৯৭৬, পৃঃ ১০৫।

(احمد عبد الغفور عطار -صقر الجزيرة الجزء الاول - مكة ١٩٦٤،ص٨٠)

৬। Arnold T. Wilson, The Persian Gulf, London: 1959, P. 53.

৭। H.St. J.B. Philby. The Heart of Arabia, London 1922, P. 6.

৮। ইবনে বিশর, উনওয়ানুল নজদ ফী তারীখে নজদ, রিয়াদ, ১৩৮৫ হিঃ পৃঃ ২০৬।

(عثمان بن عبد الله ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد- الرياض- ١٣٨٥ه، ص٢٠٦)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আব্দুল আজিজ বিন সউদের
উৎপত্তি অভ্যুদয় ও ক্ষমতা গ্রহণ

আব্দুল আজিজ বিন সউদের উৎপত্তি—

আরবদেশ মানব ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রভূমি। আরব ভূখন্ডের হেজাজ, নজদ ও আসির অঞ্চল নিয়ে বর্তমান সউদী আরব গড়ে উঠেছে। প্রায় হাজার বছরের ঘন তমাসা ভেদ করে আরব ভূখন্ডে আব্দুল আজিজ বিন সউদের নেতৃত্বে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।(১)

আধুনিক সউদী আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুর রহমান, ইবনে ফয়সল আল-সউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মার্করিন ইবনে মারখান - এর উত্তরসূরী বকর ইবনে ওয়ায়িল ইবনেজাদিলাহ্ ইবনে আসাদ ইবনে রাবিয়াহ ইবনে নজর ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান।(২) তিনি ১২৯৮ হিজরী রবিউল আউয়াল মাস ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর(৩)/ডিসেম্বর(৪) মাস সোবহে সাদেকের মুহূর্তে রিয়াদে জন্ম গ্রহণ করেন।(৪) রোবার্ট লেসি তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৭৬ বললেও যুবরাজের সাক্ষাৎকার ও অফিসিয়াল রেকর্ড অনুসারে ১৮৮০ সনই সঠিক।(৫)

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান এই সউদী রাজবংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন মানী ইবনে রাবিয়া ইবনে নাজার ইবনে মা'য়াদ ইবনে আদনান।(৬) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি হাসা অঞ্চল হতে ওয়াদী হানিফায় বসবাস শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর বংশধরেরা মধ্য আরবের দারিয়ায় একটি ক্ষুদ্র আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে সউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাকরান শাসন কর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তাঁর নাম হতেই সউদী রাজবংশের নামকরণ হয়।(৭) তিনি ১১৩৭ হিঃ ১৭২৫ খৃঃ মৃত্যু বরণ করলে(৮) তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আমীর হন।(৯)

১। *মুহাম্মদ ইবনে সউদ (প্রথম)* $\frac{\text{১১৩৯ - ১১৭৯ হিঃ}}{\text{১৭২৫ ১৭৬৫ খৃ}}$ ঃ

মুহাম্মদ ইবনে সউদ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে দারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। সউদের বংশ তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, মুহাম্মদ ব্যতীত তাঁর আরও জুনয়া'ন, মুশারী, ওফারহান নামে তিনজন পুত্র ছিল।(১০) ইবনে সউদের বংশধরগণ এখানে ওয়াহাবীদের নেতৃত্ব দান করছেন। এই বংশের ইতিহাসে ইবনে জুনয়ান ও ইবনে মুশারীর উত্তর পুরুষ কোন গুরুত্ব লাভ করেনি। ফারহান এবং তাঁর সন্তানদের উল্লেখ কেবল বংশ তালিকায় পাওয়া যায়।(১১) সউদী শাসনের রাজধানী দারিয়া থেকে পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদে স্থানান্তরিত হয়।(১২)

মুহম্মদ ইবনে সউদের দক্ষতা, যুদ্ধ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পিতার মৃত্যুর পর ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমীরাত লাভ করেন। এই সময় নজদের উয়ায়নায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব একটি আন্দোলন শুরু করেন।(১৩)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলায়মান একজন হাম্বলী ধর্মতাত্ত্বিক ও ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা।(১৪) তিনি ১১১৫ হিজরী(১৫) ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য নজদের উয়ায়নায়(১৬) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বনু সিনান বংশোদ্ভূত তামীম গোত্রের লোক।(১৭) তিনি ছিলেন ধর্মভীরু সনাতন পন্থী ও অনমনীয় ভাবাপন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পর হতে ইসলামে বিভিন্ন বেদ'আত (নতুনত্ব) শুরু হয়।(১৮) যেমন সে সময় পীরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি, দরবেশদের কবরগুলি সৌধ-নির্মাণ, কবরগুলি সেজদার স্থান বানায়।(১৯) সেখানে সৌধ নির্মাণ এবং এসব জায়গায় পূণ্যলাভের আশায় সফর ইত্যাদি বেদ'আত ব্যাপক প্রসার লাভ করে।(২০) তিনি বেদ'আত বন্ধকল্পে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আহলে সুন্নাতওয়াল জামায়তে স্বীকৃত চার মযহাব এবং সলফে সালেহীনের আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করেন।(২১) এ বিষয়ে পুস্তকও লেখেন।(২২) এই আন্দোলনের বিরোধীকারীরা একে ওয়াহাবী নামে ভূষিত করেন। ইউরোপীয় লেখকরাও এই আন্দোলনকে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করে(২৩)। মূলতঃ উক্ত সম্প্রদায় মুওয়াহেদীন (একত্ববাদী) বা সালাফিয়া (আদিমপন্থী) রূপে নাম ধারণ পছন্দ করেন।(২৪) তিনি উয়ায়নায় আন্দোলনের বিরোধীতায় সম্মুখীন হন এবং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে দারিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি আমীর মুহাম্মদ ইবনে সউদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমীর এই আন্দোলনকে সমর্থন এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের কন্যাকে বিবাহ করেন।(২৫) তিনি ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার এবং স্বীয় রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। ১১৫৭ হিজরী/১৭৪৪ সালে আমীর এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব পাস্পরিক আনুগত্য ও আস্থার ভিত্তিতে শপথ (بيعة مبارکة) গ্রহণ করেন।(২৬) তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাজত্ব পরিচালনা করেন। প্রয়োজন বোধে শক্তি প্রয়োগেও দ্বিধা করেন না।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে সউদ ক্ষুদ্র সউদী রাষ্ট্রকে মধ্য ও পূর্ব আরবে সম্প্রসারিত করেন। আমীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবকে শুধু মতবাদ প্রচারেরই সুযোগ দিলেন না বরং এর স্থায়িত্বের জন্য একটি রাজনৈতিক পরিমন্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন। উপরোক্ত মৈত্রীবন্ধন আরব জাতির আত্মিক এবং বৈষয়িক আমূল পরিবর্তনে সহায়ক হয়।(২৭) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের ধর্মীয় মতবাদ বেদুঈনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। মুহাম্মদ ইবনে সউদের

Dhaka University Institutional Repository

তেজদীপ্ত ও বলিষ্ঠ যুদ্ধস্পৃহার ফলে আরব ভূখন্ডের মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র ও শহর সউদী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হল।

হাসার যুবরাজ উক্ত আন্দোলনের বিরোধীতা করেন। তাই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হাসার নৃপতিকে পরাজিত করেন। ফলে সউদী রাজত্ব পশ্চিম দিকেও বিস্তৃতি লাভ করে।

১১৬২ হিজরী/১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ ২৫ শে ডিসেম্বর ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে মক্কার শরীফদের প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে তুরস্কের প্রথম মাহমুদ এ সম্পর্কে জ্ঞাত হন। মুহাম্মদ ইবনে সউদ একটি ক্ষুদ্র বেদুঈন রাজ্যকে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত শরীয়া ভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। এসময় হতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের ভাগ্য এবং সউদী বংশের ভাগ্য অবিচ্ছিন্ন হয়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে সউদের রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন। ১১৭৯ হিজরী/১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইন্তেকাল করেন(২৮)

২। *আব্দুল আজিজ (প্রথম) ইবনে মুহাম্মদ সউদ* $\frac{১১৭৯ \quad ১২১৮ \text{ হিঃ}}{১৭৬৫ - ১৮০৩ \text{ খৃ}}$ ঃ

মুহাম্মদ ইবনে সউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম আব্দুল আজিজ ১১৭৯ হিজরী/১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতাসীন হন।(২৯) তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় সউদী রাজ্য ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কুয়েত ভূ-খন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব তাঁকে নজদের অধিপতি পদে বংশগত অধিকার অনুমোদন করেন। আব্দুল আজিজ স্বীয়পুত্র সউদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ওয়াহাবী মতবাদ এবং সউদী রাজবংশের ক্ষমতা উত্তরোত্তোর বৃদ্ধিতে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও শেখতন্ত্রগুলি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাঁর সময় সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন এবং ওমানের সীমান্ত পর্যন্ত সউদী রাজ্য বিস্তৃত হয়।(৩০)

মক্কার শরীফ পালিব তাঁর ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য এক দল সৈন্য পাঠান, কিন্তু ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে শরীফের সেনাদল পরাজিত হয়।(৩১) এরপর আব্দুল আজিজের সঙ্গে শরীফ একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। মক্কার শরীফ এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদের শাসকের সাথে ওয়াহাবীদের এই চুক্তি অল্প দিনই স্থায়ী থাকে। ওয়াহাবীদের এক কাফেলার উপর শিয়া মতাবলম্বী খাজাইল গোত্র আক্রমণ করে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আব্দুল আজিজ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কারবালা আক্রমণ ও উহা দখল করেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কাশরীফ সউদী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত ইমাম হোসাইনের সমাধি ধ্বংস হলে সেখানকার শিয়ারা বিক্ষুব্ধ হন। ওয়াহাবী রাজত্বের প্রতি গোড়াপন্থী দারিয়ার আল-তারাইফ(৩২) মসজিদে নামাজরত অবস্থায় ৩রা নভেম্বর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন শিয়া ঘাতক তাঁকে হত্যা করে।(৩৩)

৩। *সউদ ইবনে আব্দুল আজিজ (দ্বিতীয় ইবনে সউদ)* $\frac{১২১৮-১২২৯ হিঃ}{১৮০৩-১৮১৪ খৃঃ}$ ঃ

আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় ইবনে সউদ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন।(৩৪) তিনি মক্কা শরীফকে তাঁর অধীন শাসক হিসেবে রাজ্য শাসন করার অনুমতি দেন। সউদ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মদীনা দখল করেন।(৩৫) তার পর সেখান থেকে তুর্কী নাগরিকদের তাড়িয়ে দেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর রাজ্য ওমান হতে পালমাইরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অটোমান সুলতান সেলিম এতে বিস্মিত হন।(৩৬) তিনি সউদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মিসরের ওয়ালী মুহাম্মদ আলী পাশাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বে ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি।(৩৭)

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ আলী পাশা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তুসুন পাশার নেতৃত্বে আরবদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। এই অভিযানে নৌ-বাহিনী সক্রিয় ছিল। সম্মিলিত তুর্কী বাহিনী ওয়াহাবীদেরকে বদর প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ও তায়েফ তুর্কী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।(৩৮) মক্কার শরীফ সউদীদের সাথে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে

Dhaka University Institutional Repository

কারারুদ্ধ হন। ইবনে সউদ ১২২৯ হিজরী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে দারিয়ায় ইন্তেকাল করেন।(৩৯)

৪। *আব্দুল্লাহ ইবনে সউদ* $\frac{\text{১২২৯ - ১২৩৩ হিঃ}}{\text{১৮১৪ - ১৮১৮ খৃ}}$ ঃ

সউদ ইবনে আব্দুল আজীজের মৃত্যুর পর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ক্ষমতাসীন হন।(৪০) তাঁর সাথে মিশরীয় তুর্কীদের পুনরায় বিরোধ শুরু হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ আলী পাশা তারাবা শহরে ওয়াহাবীদেরকে পরাজিত করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা স্বীয় পুত্র ইব্রাহীম পাশার উপর সামরিক অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে মিসরে চলে যান।(৪১) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর হতে ১৮ মাসের বিরতিহীন যুদ্ধের পর ইব্রাহীম দারিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আব্দুল্লাহ ইব্রাহীমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আব্দুল্লাহকে পদচ্যুত করে বন্দী হিসেবে ইস্তাম্বুলে পাঠানো হয়। এভাবে মুহাম্মদ ইবনে সউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর ১২৩৩ হিজরী ইস্তাম্বুলে তাঁকে হত্যা করা হয়।(৪৩)

৫। *মুশারী ইবনে সউদ* $\frac{\text{১২৩৫ - ১২৩৫ হিঃ}}{\text{১৮১৯ - ১৮১৯ খৃ}}$ ঃ(৪৩)

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ইব্রাহীম পাশা নজদ ত্যাগ করলে নিহত আব্দুল্লাহর ভ্রাতা মুশারী ইবনে সউদ দারিয়ায় নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি নিজে আল-আরিদে বসবাস করতে থাকেন। কিছুদিন পর তাঁর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ আলী পাশা হুসায়েন বেগকে পাঠান। বেগ তাঁকে গ্রেফতার করে মিশরে পাঠিয়ে দেন। তিনি ১২৩৫ হিজরী/১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পথে ইন্তেকাল করেন।(৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

৬। *তুর্কী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সউদ* $\frac{\text{১২৩৫ - ১২৪৯ হিঃ}}{\text{১৮২০ - ১৮৩৪ খৃ}}$ ঃ

মিশরীয় আক্রমণের সময় তিনি সিদির(৪৫) নামক স্থানে চলে যান। তাঁর পুত্র তুর্কী সেখান থেকে সউদী রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিশরীয়গণ তাঁকে উক্ত স্থান হতে তাড়িয়ে দেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদে মিশরীয় সেনাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রিয়াদ জয় করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা অভিযান চালাবার পর তুর্কী মুহাম্মদ আলীকে কর দিতে বাধ্য হন। বিনিময় তুর্কীকে রাজত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আল-হাসা ও বাহারাইন অধিকার করেন। তুর্কী দারিয়া থেকে ১২৪৯ হিজরী/১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। রিয়াদের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজরত অবস্থায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আততায়ী কর্তৃক তিনি নিহত হন।(৪৬)

৭। মুশারী ইবনে আবদির রহমান ইবনে মুশারী ইবনে সউদ তুর্কী ইবনে আবদিল্লাহকে হত্যা করেন। কিন্তু চল্লিশ দিন পর হুফুফে আব্দুল্লাহর উপর আক্রমণ করা হয়। ফয়সলের (৬) পুত্র তাঁকে হত্যা করে।(৪৭)

৮। *ফয়সল ইবনে তুর্কী (প্রথম শাসনকাল)* $\frac{\text{১২৫০ - ১২৫৫ হিঃ}}{\text{১৮৩৪ - ১৮৩৯ খৃ}}$ ঃ (৪৮)

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর পুত্র ফয়সল রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সউদ (৩) এর পুত্র খালিদ মিশরীয়দের সহযোগীতায় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে দারিয়া দখল এবং ফয়সলকে রিয়াদে পরাজিত করেন। মিশরীয় সেনাপতি খুরশীদ পাশা ২৫ রমজান ১২৫৪ হিজরী/১২ ডিসেম্বর ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ফয়সলকে আদ-দেলেম(৪৯) নামক স্থানে পুনরায় পরাজিত এবং তাঁকে মিশর প্রেরণ করেন। কিন্তু ১২৫৯ হিজরীতে তিনি সেখান থেকে পরায়ন করেন। তিনি আল-হাসা, আল-কাসিম এবং আল-আরিদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।(৫০)

Dhaka University Institutional Repository

৯। *খালিদ ইবনে সউদ* $\frac{\text{১২৫৫ - ১২৫৭ হিঃ}}{\text{১৮৩৯ - ১৮৪১ খৃঃ}}$ ঃ

ইব্রাহীম পাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তিনি মিশর চলে যান। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশার সাহায্যে ১২৫২ হিজরী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফয়সল ইবনে তুর্কীর বিরুদ্ধে দারিয়ায় এক অভিযান চালান।(৫১) ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় সেনাপতি ইব্রাহীমের মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আব্দুল্লাহ ইবনে ছুনয়ান খালিদকে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে রিয়াদ হতে তাড়িয়ে দেন।(৫২) তারপর পরিস্থিতি তাঁর প্রতিকূলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ছুনয়ান প্রথমে ১২৫৭ হিজরী/১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আদ-দামাম পরে কুয়েত এবং সেখান থেকে মক্কা হয়ে জেদ্দা গমন করেন।

১০। *আব্দুল্লাহ ইবনে ছুনয়ান* $\frac{\text{১২৫৭ - ১২৫৯ হিঃ}}{\text{১৮৪১ - ১৮৪৩ খৃঃ}}$ ঃ (৫৩)

প্রথমে তিনি খালেদের আনুগত্য স্বীকার করেন। পরে তাঁর বিরোধী হন। তিনি মাত্র এক বছর রাজত্ব করেন। ফয়সল ইবনে তুর্কী রিয়াদে আব্দুল্লাহকে বন্দী করেন। ১২৫৯ হিজরী/১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১১। *ফয়সল ইবনে তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল)* $\frac{\text{১২৫৯ - ১২৮২ হিঃ}}{\text{১৮৪৩ - ১৮৬৫ খৃঃ}}$ ঃ

স্বীয় বিজ্ঞচিত এবং শান্তিকামী প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি হাইলের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে রশীদের সহযোগিতায় মিশরীয়দেরকে পরাজিত এবং নজদ হতে বিতাড়িত করেন। এরপর তিনি নজদে নিজ বংশের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মিশর এবং তুরস্কের সুলতানের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। রজব ১৩, ১২৮২ হিজরী/২, ডিসেম্বর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফয়সল ইবনে তুর্কী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে রিয়াদে ইন্তেকাল করেন।(৫৪)

Dhaka University Institutional Repository

১২। *আব্দুল্লাহ ইবনে ফয়সল ইবনে তুর্কী (প্রথম শাসনকাল)* $\frac{১২৮২ - ১২৮৭ হিঃ}{১৮৬৫ - ১৮৭১ খৃঃ}$ ঃ

পিতা ফয়সলের মৃত্যুর পর আব্দুল্লাহ ক্ষমতাসীন হন। ১২৮৭ হিজরীতে তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৩। *সউদ ইবনে ফয়সল ইবনে তুর্কী* $\frac{১২৮৭ - ১২৯১ হিঃ}{১৮৭১ - ১৮৭৪ খৃঃ}$ ঃ

তাঁর শাসনকালের শুরুতে তুর্কীগণ আব্দুল্লাহর আহ্বানে (যিনি নির্বাসিত ছিলেন) কাতিফ ও আল-হাসা দখল করেন। সউদ তা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও তুর্কীদের দখলে থাকে। ১২৯১ হিজরী/১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।(৫৫)

১৪। *আব্দুল্লাহ ইবনে ফয়সল ইবনে তুর্কী (দ্বিতীয় শাসনকাল)* $\frac{১২৯১ - ১৩০১ হিঃ}{১৮৭৪ - ১৮৮৪ খৃঃ}$ ঃ

সউদের ইন্তেকালের পর তিনি পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। মুহাম্মদ ও সউদের পুত্রদের বিরোধীতা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইলের শাসক মুহাম্মদ ইবনে রশীদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রগণ অর্থাৎ সউদের পুত্রগণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁকে নির্বাসিত করেন।(৫৬)

১৫। ফলে মুহাম্মদ ইবনে সউদ ক্ষমতাসীন হন। তাঁর শাসনকাল ছিল স্বল্প দিনের।

১৬। *আব্দুর রহমান ইবনে ফয়সল* $\frac{১৩০৭ - ১৩০৯ হিঃ}{১৮৮৯ - ১৮৯১ খৃঃ}$ ঃ

মুহাম্মদের পিতৃব্য আব্দুর রহমান ইবনে ফয়সল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বাদশাহ সউদের পিতামহ ছিলেন। তিনি দু'বার ক্ষতাসীন হন - প্রথমবার ভ্রাতা সউদের মৃত্যুর পর। কিন্তু একবছর পরই তিনি স্বীয় ভ্রাতা আব্দুল্লাহর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি পুনরায় আর একবার ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে রশীদ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।(৫৭) তিনি তুরস্কের সুলতানের সমর্থক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে ফয়সলকে ইবনে রশীদ তৃতীয়বার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। আব্দুল্লাহ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (যিরিকলীর মতে মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী/১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে) (৫৮) এরপর রিয়াদ হাইলের অধীন চলে যায়। তা সত্ত্বেও আব্দুর রহমান পুনরায় সিংহাসন দখলের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন। তাঁকে রিয়াদ হতে কাতারে বিতাড়িত করা হয়।(৫৯) তারপর তিনি বাহরাইন যান। সেখান থেকে সপরিবারে কুয়েতে এসে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

১৮। ফয়সলের তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদকে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য রিয়াদের আমীর নিযুক্ত করেন।(৬০)

অভ্যুদয়—

আব্দুল আজিজ বিন সউদ যিনি সাধারণভাবে ইবনে সউদ নামে পরিচিত।(৬১) তিনি ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী প্রধান ব্যক্তি। তিনি উক্ত মতাদর্শকে সার্বজনীন করার প্রয়াস নিয়ে আবির্ভূত হন।

তাঁর মাতা সুদায়রী দোয়াশীর গোত্রের নেতা বীর যোদ্ধা আহমদের কন্যা।(৬২) আব্দুল আজিজ ছাড়া আরও তিনটি পুত্র সন্তান মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ এবং সা'দ এর জননী ছিলেন। আব্দুল আজিজের ধমনীতে মাতৃ ও পিতৃকূলের সম্ভ্রান্ত রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাঁর মাতার পূর্ব পুরুষ অত্যন্ত পুরানো ও সম্ভ্রান্ত ছিল। মক্কার কাবা শরীফের রক্ষক ইবনে কাতাদাহ হাশেমী বংশোদ্ভূত ছিলেন।(৬৩)

দারিয়া নজদের পুরানো রাজধানী ছিল। এখানে আব্দুল আজিজ তাঁর মাতার সঙ্গে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করছিলেন।

একবার তাঁকে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানে একজন সুদানী ক্রীতদাসের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সেখানে তাঁকে পিতৃব্যপুত্র, রাজকর্মচারী এবং কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল শিশুর সাথে বসবাস করতে হতো। লেখা-পড়ার বয়স হলে তাঁর শিক্ষার ভার তাঁর পিতা নিজেই গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াহাবীদের ইমামের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই ছেলের প্রতি তেমন নজর দিতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

চার বছর বয়সে তাঁকে রিয়াদে একজন শিক্ষকের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁকে শুতে হতো কাঠের খাট ও ডোরা চাদরের উপর।

এগার বছর বয়সে তিনি কুর'আনে হাফেজ হন।(৬৪) তবে কুর'আনের ব্যাখ্যা তাঁকে শেখানো হয়নি। বাল্যকালে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনে তাঁর আগ্রহ ছিল না। শিক্ষকগণও তাঁর তেমন যত্ন নেয়নি। শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের সাথে মারামারি করতেন। ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কোন রকম শৈথিল্য সহ্য করতেন না। সাত বছর বয়স থেকে তিনি মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করতেন এবং রোজা রাখতেন।(৬৫)

তাঁর পিতা আব্দুর রহমান যোদ্ধা ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি বংশ গৌরব পুনরুদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ওয়াহাবী মতবাদ আরবের সব গোত্রের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করেন। পিতা তাঁকে নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। আট বছর বয়সে তিনি ভারী তলোয়ার চালানো, মল্লযুদ্ধ, তীর চালনা অশ্বচালনা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হন। প্রচন্ড গরমে তপ্ত মরুতে খালিপায়ে হাঁটা ও দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করার অভ্যাস করেন।(৬৬) অপরদিকে শীতে তুষারাবৃত স্থানে সূর্যোদয়ের আগে দু' ঘন্টা ব্যায়াম করতেন। ফলে সব রকম প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলা করতে পারতেন। একবার তিনি ইবনে সউদকে বলেছিলেন, একটি খেজুর, এক গ্লাস পানি এবং তিন ঘন্টা নিদ্রা একজন প্রকৃত বেদুঈনের জন্য যথেষ্ট।(৬৭) কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর প্রিয় কাজ ছিল কুস্তি ও অশ্বচালনা। শত্রুর মোকাবেলার সময় তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হতো। কিন্তু তা দীর্ঘ স্থায়ী হতো না। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি শান্ত ও নম্র প্রকৃতির ছিলেন। রিয়াদে অন্ধকারে যখন ঝড়ো হাওয়া বইতো তখন তিনি শহরবাসীদের বিপদমুক্ত করতে এগিয়ে আসতেন।

সউদী বংশের রাজত্বের ধারাবাহিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদের সউদী বংশ হাইলের রশীদী বংশের কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হাইলের অতি শক্তিশালী আমীরের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত মিত্র সংঘ গঠিত হয়।(৬৮) এই সঙ্ঘে যোগদান করেনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১) সংগ্রামপ্রিয় যামিলের নেতৃত্বে, উনায়যা' গোত্র;

২) রিয়াদের সমস্ত রাজপরিবার

৩) বুরায়দা, রাস এবং শাকরা নগরত্রয় এবং

৪) উতায়বা ও মুতায়র এর সম্মিলিত গোত্র সমূহ।

পূর্ণ একমাস যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে পরিস্থিতি মিত্রগণের অনুকূলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত মার্চ মাসের শেষের দিকে ইবনে রশীদ মুলায়দার যুদ্ধে বিজয়ী হন।(৬৯) এই যুদ্ধে আব্দুর রহমানের দুই ভাই আবদুল্লাহকে রশীদ ও মোহাম্মদকে ওবায়েদ হত্যা করে। যুদ্ধের সময় রিয়াদের শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফয়সলের অপর পুত্র আব্দুর রহমানের উপর।(৭০) আল-মলায়দাতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হাইলের আল-রশীদ সউদদিগকে পরাজিত ও নজদ থেকে তাড়িয়ে দিলে আব্দুর রহমান প্রথমে বাহরাইন ও পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুয়েতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।(৭১) আব্দুল আজিজ নির্বাসনে পিতার সঙ্গে বড় হতে থাকেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে রশীদ সমগ্র মরু আরবে রাজত্ব করেন।(৭২)

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আব্দুল আজিজ ১৫ বছর বয়সে আব্দুল ওয়াহাবের উত্তরসূরী ভ্রাতুস্পুত্রী রাজকুমারী জোহরাকে বিবাহ করেন। জোহরা ১৮৯৯ সালে তুর্কী নামে একটি পুত্র সন্তান এবং দ্বিতীয় বছর খালিদ নামে আর একটি পুত্র সন্তানের জননী হন। আব্দুর রাহমানের কুয়েতে নির্বাসিত অবস্থায় থাকার সময় শেখ মোবারকের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর সাংসারিক খরচ বৃদ্ধি পায়। এই সময় ইবনে সউদ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পোর্ট শুওয়ায়েখ ছোট বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কারখানায় শ্রমিকের কাজ শুরু করেন। কুয়েতের শেখ মুবারক ইবনে সউদকে দেখে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এই যুবকের মধ্যে বিশেষ গুণ বিদ্যমান, ভবিষ্যতে স্মরণীয় কিছু করতে পারবে।(৭৩) আব্দুল আজিজের বয়স ১৫ বছর। সমবয়সীদের চেয়ে পড়াশুনায় পশ্চাতে ছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হতেই তাঁর প্রতিকূল অবস্থায় জীবন যাপন দেহ ও মনকে সুদৃঢ় করে। পুঁথিগত বিদ্যার স্বল্পতা, তাঁর বাস্তব

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি ও ধীশক্তি বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কুয়েতে মোবারক তাঁকে নতুনভাবে লেখাপড়া এবং নিজেকে গঠন করার পরামর্শ দেন।(৭৪) শেখ মোবারক তাঁকে ইতিহাস, ভূগোল, অংক, ইংরেজী ইত্যাদিতে শিক্ষিত করে সচিবের দায়িত্ব ভার দেন। এইভাবে তাঁর অন্তর্নিহিত মেধা ও কর্মক্ষমতা বিকাশের সুযোগ আসে। শেখ মোবারক তাঁকে বিভিন্ন সম্মেলনে নিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন পেশাজীবি, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, ব্যাংক, বেসামরিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, পর্যটক, ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান এবং রাশিয়ানদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন। বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।(৭৫)

রশীদী বংশের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইবনে রশীদ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে সউদী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। আব্দুল আজিজ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তী পর্যায়ে রশীদী রাজবংশের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

ক্ষমতা দখল—

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাতের অন্ধকারে মাত্র ৬০(৭৬) / ৪০(৭৭) জন অনুসারী নিয়ে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ রিয়াদ নগরে প্রবেশ এবং রশীদ বংশের ওয়ালী আজলনাকে হত্যা করেন। এইভাবে তিনি পুরাতন সউদ বংশের রাজধানী রিয়াদ দখল করেন।(৭৮) এরপর তাঁর পিতা আব্দুর রহমান তাঁকে নজদের আমীর ও ওয়াহাবীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।(৭৯) তিনি রশীদী পরিবারের শাসক আব্দুল্লাহ আল-আবদুল আজিজ ইবনে মিতাবকে পরাজিত এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দখল করেন। এরপরে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অবশিষ্ট রশীদী সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত তুর্কী ও রশীদী সেনাবাহিনী নজদে পরাজিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আল রশীদের মৃত্যুর পর নজদের উপর ইবনে সউদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।(৮০) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শরীফ দখল করেন। ইবনে মিতাব

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর মক্কায় ওয়াহাবী মতবাদ এবং সউদী রাজক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর তিনি আল হাসা ও অন্যান্য আরব উপসাগরীয় অঞ্চল যা তখনও তুর্কীদের অধীন ছিল তা দখলের চেষ্টা করেন। তিনি বৃটেনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে টি.ই. লরেন্সের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য বহুলাংশে বৃটেনের সৃষ্টি। একমাত্র লেভান্ট(৮১) বর্তমানের সিরিয়া ও লেবানন ছাড়া প্রায় আরব ভূমিতে ইংরেজ প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরব বিদ্রোহীদের মিত্রশক্তিরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আরব ভূমিতে তাঁদের একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতিপুঞ্জের ম্যানডেট অনুসারে তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব গোত্রগুলির উপর কর্তৃত্ব পায়। প্রায় মরু অঞ্চলে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সউদী আরবকেই শুধু অখন্ডিত স্বাতন্ত্র্য দেয়া হয়েছিল। মিশর ছিল উপনিবেশ, যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। ম্যানডেট অনুসারে বৃটেন পেল প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাক। ফ্রান্স লেভান্ট বর্তমানের সিরিয়া ও লেবানন লাভ করে। প্রজাতান্ত্রিক-ফ্রান্স তাঁর বৈরী ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে কিছু গণতন্ত্রের ভাবধারা আমদানী করে। এসব হচ্ছে সীমাবদ্ধ নির্বাচন, বাছাই করা লোক নিয়ে তৈরী পার্লামেন্ট এবং বিপ্লবী চিন্তাধারা। বৃটিশ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় ক্রীড়নক নৃপতি, সামন্ত তাবেদার হঠাৎ ধনী শ্রেণী এবং পেশাদার রাজনীতিবিদ। এসব অঞ্চলেও গড়ে উঠল পার্লামেন্ট, আমদানী হল নির্বাচন প্রচারিত হ'ল গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার। পশ্চিমা ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ আরব ভূমিতে কখনোই শিকড় গাড়তে পারেনি এবং পরাধীনতার প্রভাবে সেখানে স্বকীয় চিন্তাধারা কিংবা সক্ষম ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

আরবদেশ সমূহে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কর্ণেল(৮২) টি.ই. লরেন্স। তিনি লরেন্স অব আরাবিয়া নামে পরিচিত।(৮৩) তিনি ১৯০৯ সনে মধ্যপ্রাচ্য আগমন করে দীর্ঘ ১১ বছর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তারই প্ররোচনায় আরবগণ(৮৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সক্রিয় মিত্র হয়ে উঠেছিল।(৮৫) তিনি পোষাকে-আষাকে,

Dhaka University Institutional Repository

কথাবার্তায়, চালচলনে, আচার-আচরণে আরবগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেন।(৮৬) বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিলের তিনি বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতা ছিলেন। বৃটিশ সরকারের আরব নীতি বহুদিন লরেন্সের পরামর্শ অনুযায়ী চলছিল। সিরিয়া বিতাড়িত ফয়সলকে ইরাকের রাজ্য বানানোর মূলেও তিনি(৮৭), চার্চিল আবদুল্লাহকে ট্রান্সজর্ডানের আমীর বানানোর পরামর্শ তাঁর থেকেই পেয়েছিলেন।(৮৮)

লরেন্স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ সেভেন পিলার্স অব উইসডম-এ তার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা মর্মস্পর্শী। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদীকে এই বর্ণনা সাবধান করেছে। যদিও তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। "বহু বছর আরব পোষাকে বাস করে, আরব মানসের অনুকরণ করে আমি যেন আমার ইংরেজ সত্ত্বা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি। পাশ্চাত্য ও তার নিয়ম কানুনের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে পেরেছি। আমার কাছে তা মিথ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরব সত্ত্বা ও আমি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারিনি, যা করেছি শুধু নকল মাত্র। মানুষকে ধর্মে অবিশ্বাসী করা সহজ, ধর্মান্তরিত করা বড়ই কঠিন। আমি একটি সত্ত্বা ত্যাগ করে অন্য একটি সত্ত্বা গ্রহণ করেছিলাম, তার ফলে একটা সর্বগ্রাসী একাকীত্ব আমাকে পেয়ে বসেছিল। মানুষকে নয়, মানুষের সব কাজেই আমি তুচ্ছতা ও বিদ্রূপের চোখে দেখতে পাচ্ছি। যে মানুষ দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শ্রম করেছে, তার পক্ষে এই ক্লান্ত ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। তার দেহযন্ত্রের মতো খেটে গেছে, যুক্তিবাদী মনকে সে রেখে এসেছে অনেক পশ্চাতে - সে-মন বাইরে থেকে তার কর্মকে নিরীক্ষণ করেছে সমালোচনার চোখে, অবাক হয়ে ভেবেছে, ব্যর্থ - পরিশ্রম। এসব কি করছে, কেন করছে? মাঝে মাঝে আমার এই দু'টি বিরোধী সত্ত্বা মহাশূন্যে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করত, আর তখন আমি যেন উন্মাদ - প্রায় হয়ে উঠতাম। অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে যে একই সময় দু'টি সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশকে বিচার করতে চায়, তার উন্মাদ হওয়া বিচিত্র নয়।"(৮৯) টি.ই. লরেন্সের ব্যর্থতা তাঁর নির্মম একাকীত্ব, মানুষের সব কর্মের প্রতি বিদ্রূপ এবং তাঁর প্রায় উন্মাদ ভাব ইংরেজের ত্রিশ বছরের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সবচেয়ে কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য লরেন্স অব আরাবিয়ার মতো রোমান্টিক চরিত্রের স্থান ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইবনে সউদ আরবে নিজের জয় পতাকা উত্তোলন করেন।(৯০) ত্রিশ বছরের মধ্যে দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্য। সে রাজ্য সে দিন ছিল এতই বিত্তহীন, শুধুই মরুপ্রান্তর যে, ইংরেজ তাঁকে মেনে নিয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচার শাসনে কোন বাধা দেয়নি।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে একদিন রাত্রে বৃটেনের উপনিবেশ মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল(৯১) জেরুজালেমে নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করেন একজন আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, হেজাজের শরীফ হোসাইনের দ্বিতীয় পুত্র। চার্চিলের সঙ্গে আরব ব্যাপারে তাঁর প্রধান পরামর্শ দাতা, টি.ই. লরেন্স।(৯২) লরেন্সের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে মিত্রশক্তি সহায়ক আরব গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে তার দুই প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, হোসাইন এর পুত্র ফয়সল ও আব্দুল্লাহ। সেই নৈশ ভোজের পর দীর্ঘ আলোচনায় চার্চিল ঠিক করলেন ট্রান্স-জর্ডান নামে একটি ছোট দেশসৃষ্টি করে তার আমীর বানানো হবে আব্দুল্লাহকে; এখানে থাকবে বৃটেনের সামরিক ঘাটি, বেদুঈন উপজাতিদের নিয়ে তৈরী একদল সাহসী সৈনিক গঠিত হবে একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে, বৃটেন আর্থিক সাহায্য দিয়ে রাজকোষের ঘাটতি পূরণ করবে। বিনিময়ে আব্দুল্লাহ ইংরেজের বিশ্বস্ত ও বংশবদ মিত্রে পরিণত হবেন।

আব্দুল্লাহ তাঁর নতুন রাজত্বে আগন্তুক। তখন ট্রান্সজর্ডানের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগ বেদুঈন উপজাতি। তাদের যাযাবর জীবনকে পুনর্গঠন করে আব্দুল্লাহ তাঁর দেশ তৈরী করলেন। এক সীমান্ত অতিক্রম করে সহোদর ফয়সলের রাজ্য ইরাক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট ফয়সল ইরাকের রাজত্ব প্রাপ্ত হন।(৯৩) উভয়েই সউদী আরবের ঘোর বিদ্বেষী। ফয়সলকে ইরাকের এবং আবদুল্লাহকে ট্রান্সজর্ডানের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার ফলে আরবের ইবনে সউদ ও হাশেমীয়দের মধ্যে শুরু হয় জীবনপণ সংগ্রাম। ব্রিটিশ সরকারেরএই নীতির জন্যই আরব জাহানের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্লাবের নেতৃত্বে আবদুল্লাহর একটি সুশিক্ষিত বেদুঈন সেনাবাহিনী তৈরী হয়। তিনি গ্লাবপাশা নামে পরিচিত।।(৯৪) সৈন্য বাহিনীর নাম আরব লিজন,(৯৫) যার একটি অহংকার দোষে দুষ্ট কাহিনী গ্লাব সাহেব সম্প্রতি লিখেছেন। গ্লাব তাঁর একটি আত্মকথা ও রচনা করেছেন, যাতে জর্ডান ইতিহাস অনেকখানি বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহর রাজত্বের প্রধানতম ভিত্তি ছিল ইংরেজের মৈত্রী ও সাহায্য।(৯৬) আব্দুল্লাহর আত্মরচিত যখন প্রথম ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র আরব ভূমিতে। প্রকাশ করা সমস্ত কপি বাজার থেকে তুলে নিতে তিনি বাধ্য হন। বর্তমানে ফিলিপ গ্রেভস সম্পাদিত আব্দুল্লাহর যে 'আত্মকথা' বাজারে চালু তাতে আব্দুল্লাহর ইংরেজ প্রীতি মিশর ও সউদী আরব বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের মূল নায়ক টি.ই. লরেন্সের পরামর্শ ক্রমেই সংঘটিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালের মধ্যে নজদ ও আসীর ইবনে সউদের রাজ্যভুক্ত হয়। ইবনে সউদ উপলব্ধি করলেন স্থানীয় সংগঠন ব্যতিত বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন রাজ্য জয়ের জন্য অনুকূল হবে না।(৯৭) তিনি দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেনঃ(৯৮)

(১) ইসলামের মূল শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ এবং তাঁদের মাধ্যমে দক্ষ কৃষি শ্রমিক গঠন।

(২) বেদুঈনের ভূমি কর্ষণ ও স্থায়ীভাবে খামারে বসবাস করার উৎসাহ দেন।(৯৯) আব্দুল আজিজ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে নজদ, হাসা, কাতিফ, জুবাইল, প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।(১০০)

ইবনে সউদের অনন্য সাধারণ গুণাবলী ছিলঃ-

(১) একমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাস তাঁর নির্দেশ মোতাবেক শাসনকার্য আল-কুরআনের শিক্ষায় পরিচালনা ও আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থা।

(২) আল-হাদীস অনুশীলন ওলামা এবং মুফতিগণের সঙ্গে প্রাত্যহিক বৈঠক।

(৩) অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা ও সুচতুর রণকুশলী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন না। যুদ্ধের চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন।(১০১)

মানুষ হিসেবে তিনি নম্র সহিষ্ণু ও অমায়িক ছিলেন। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন শৈথিল্য আপোষ সহ্য করতেন না।(১০২)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. BBC, World Wide Magazine, Garrald Hous, 2-6 Homesdale Road, UK, August, 1995, P-22.

২. Ameen Rihani, Ibn Saud of Arabia, London, 1928, P. XVI.

৩. মুফতী মুহম্মদ আব্দুল কাইউম কাদেরী, তারীখে নজদ ও হেজায (উর্দু), লাহোর, ১৩৯৮ হিজরী, পৃঃ ৪১১.

৪. আহমদ আব্দুল গফ্ফুর আত্তার, ছকরুল জাযীরা, প্রথম খন্ড, মক্কা, ১৯৬৪, পৃঃ ৮০ ।

৫. Robert Lacey; The Kingdom, London; 1981, PP. 561-62.

৬. ছালাহুদ দীন মুখতার, তারীখুল মামলাকাতুন আরাবিয়াতুস সাউদীয়া ফী মাজিহা ওয়াহাজেরুহা, দারে মাক তাবাতে হায়াত, বৈরুত, ১৩৯০ হিজরী, পৃঃ ৬৮ ।

৭. The Kingdom of Saudi Arabia, London: 1977, P. 77, Kingdom of SAudia Arabia, Ministry of Information, Construction and Growth, 1992, P. 7.

৮. K.S.A. M/I. This is our Country, 1993, P. 7.

৯. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২ ।

১০. K.S.A. op. Cit P.7.

১১. রশীদ ইবনে আলী আল-হাম্বালী মুছীরুল ওয়াজদ ফী মারেফাতে মুলুকে নজদ, মিশর, ১৩৭৯ হিঃ পৃঃ ১৫.

Dhaka University Institutional Repository

১২. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

১৩. ঐ, পৃঃ ১৩.

১৪. ইবনে গানাম, রওজাতুল আফকারঃ প্রথম খন্ড, মক্কা, ১৩৭০ হিঃ, পৃঃ ২৫।

১৫. Faud Al-Farsy, Modernity and Tradition, London: 1992, P. 11.

১৬. ডঃ ছালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আবুদ: আকীদাতুশ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ৬৯.

১৭. ঐ, পৃঃ ৫৯১।

১৮. Ministry of Informaiton, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

১৯. উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ বিশর, উনওয়ানুল মাজদ ফী তারীখে নজদ, রিয়াদ, ১৩৮৫ হিঃ, পৃঃ ৯.

২০. ঐ, পৃঃ ৯।

২১. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

২২. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১০।

২৩. K.S.A. M19, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

২৪. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

২৫. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

২৬. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০২।

২৭. Asad, Saudi Arabia Between Past and Present, Jeddah: 1979, P. 40.

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৪ ।

২৯. শায়েখ হোসাইন ইবনে গানাম, তারীখে নজদ, ২ খন্ড, রিয়াদ, ১৩৮৬ হিঃ, পৃঃ ৭৪ ।

৩০. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ।

৩১. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩ ।

৩২. ঐ, পৃঃ ৫৪ ।

৩৩. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ।

৩৪. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫ ।

৩৫. Al-Farsy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩ ।

৩৬. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ।

৩৭. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮ ।

৩৮. ঐ, পৃঃ ৬০ ।

৩৯. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪১ ।

৪০. Al-Farsy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২ ।

৪১. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩ ।

৪২. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪১ ।

৪৩. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭ ।

৪৪. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫ ।

৪৫. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪২ ।

৪৬. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ ।

৪৭. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. K.S.A. M/9, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭ ।

৪৯. ইব্রাহীম ইবনে ছালেহ, তারীখে বায়দুল হাওয়াদেছ ফী নজদ, রিয়াদ, ১৩৮২ হিঃ, পৃঃ ১৯৭ ।

৫০. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০ ।

৫১. দানেশগাহ, পাঞ্জাব, লাহোর, ১ম খন্ড, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৫০, আত্তার প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬ ।

৫২. ঐ, পৃঃ ৭১ ।

৫৩. ঐ, পৃঃ ৭১ ।

৫৪. ঐ, পৃঃ ৭৩ ।

৫৫. ঐ, পৃঃ ৮৬ ।

৫৬. ঐ, পৃঃ ৭৭ ।

৫৭. Al-Farsy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩ ।

৫৮. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮ ।

৫৯. ঐ, পৃঃ ৮০ ।

৬০. শেখ মুহাম্মদ হায়াত, তারীখে সউদী আরব (উর্দু) পাকিস্তান, ১৯৯২, পৃঃ ২০৯ ।

৬১. Lacey, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬২-৬৩ ।

৬২. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২ ।

৬৩. Jacques Benoist, Arabian Destiny, London, 1957, P. 58.

৬৪. Encyclopaedia Islam, Vol-III, 1960, P. 93.

৬৫. Benoist, Ibid, P. 59.

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. Assah Ahmed, Miracle of the Desert Kingdom, London, 1972, P. 20.

৬৭. ঐ, পৃঃ ২০ ।

৬৮. Encyclopaedia Islam, 1960, vol. 7,P. 306.

৬৯. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮ ।

৭০. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬ ।

৭১. Al-Farsy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩ ।

৭২. Troeller Gary, The birth of Saudi Arabia, London, 1976, P. 19.

৭৩. Benoist, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩ ।

৭৪. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮ ।

৭৫. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮ ।

৭৬. আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১ ।

৭৭. H.R.P. Dickson, Kuwait and Her Neighbours, 1937, P. 138.

৭৮. ঐ, পৃঃ ১০১ ।

৭৯. Benoist, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০ ।

৮০. Al-Farsy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬ ।

৮১. T.E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, London, 1943, P. 171.

৮২. Richard Aldington,Lawrence of Arabia, London, 1955, P. 293.

৮৩. Ibid, P. 11.

৮৪. Ibid, P. 311.

৮৫. Richard Colonel, 1917, P. 293.

৮৬. Robert Graves, Lawrence and the Arabs, London, 1956, P. 337.

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২ ।

৮৮. Sir, J.B. Glubb, Britain and the Arabs, London, 1959, P. 123.

৮৯. Lawrence, Ibid, P. 30.

৯০. Ibid., P. 62.

৯১. Ibid. Churchill Winston.

৯২. Lawrence, Ibid. P. 276.

৯৩. Glubb, Ibid. P. 126.

৯৪. Ibid., P. 79.

৯৫. Ibid., P. 86.

৯৬. Ibid. P. 89.

৯৭. Area Hand book for Saudi Arabia.

৯৮. Sk. Mohammad Iqbal, Saudi Arabia, Kashmir, 1986, P. 66.

৯৯. Al-Farsy, Ibid., P. 16

১০০. Ahmed, Loc Cit. P. 28-29.

১০১. K.S.A. M/9, o. cit. P. 12.

১০২. Glubb, Ibid. P. 208.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের উৎপত্তি

ইখওয়ানের পরিচয়—

আব্দুল আজিজ বিন সউদের ক্ষমতা দখল ও আধুনিক সউদী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইখওয়ানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ হতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইবনে সউদকে রিয়াদের রশীদী রাজ পরিবার, মক্কার শরীফ হোসাইন এবং তুর্কী সুলতানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।(১) এই প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য তিনিই ইখওয়ান আন্দোলনের সূচনা করেন।(২)

১৯০১ সনে প্রথম তিনি যখন তাদের সংস্পর্শে আসেন ও ১৯১২ সালের পূর্বে তখন তাদের ইখওয়ান নামকরণ ছিলনা।(৩) আরবের বিভিন্ন উপজাতীয় বিরোধিতা বন্ধ করে তাদের মধ্যে একতা ও জাতীয় চেতনাবোধের সৃষ্টিই ছিল এই দল গঠনের উদ্দেশ্য।(৪) ইখওয়ান ছিল সামরিক শক্তি ভিত্তিক একটি সংঘ। ইবনে সউদ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ও তাদের দ্বারা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপকে সুদৃঢ় করবার প্রয়াস পান।(৫)

১৯০২ সনে রিয়াদ বিজয়ে ইবনে সউদের সাথে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নামঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১) যুবরাজ আব্দুল আজিজ বিন সউদ ।

২) আবদুল্লাহ ইবনে জুলুবী ।

৩) আব্দুল আজিজ ইবনে মুসায়াদ ইবনে জুলুবী ।

৪) নাসের ইবনে ফারহান আল-সউদ ।

৫) মোহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে শাহলুব ।

৬) ইব্রাহীম-আল নফিসী ।

৭) ফাহাদ আল-মাশুক ।

৮) সায়াদ ইবনে বাথীত ।

৯) আব্দুল আজিজ আর-রাবী ।

১০) মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান (যুবরাজের ভ্রাতা) ।

১১) ফাহাদ ইবনে জুলুবী ।

১২) আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে তুর্কী আল-সউদ ।

১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে সানীতান আল-সউদ ।

১৪) ফাহাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মাশারী আল-সউদ ।

১৫) হাজ্জাম আল-আজালীন আদ-দোশারী ।

১৬) আব্দুল্লাহ ইবনে শাতের আদ-দোশারী ।

১৭) সালাব আল-আজালীন আদ-দোশারী ।

১৮) মানসুর ইবনে হামজা আল-মানসুর ।

১৯) সালেহ ইবনে সাবয়ান ।

২০) ইউসুফ ইবনে মাশখাছ ।

২১) সাইদ ইবনে সুলতান আদ-দোশারী ।

২২) মাসউদ আল-মাবরুক ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩) মোহাম্মদ ইবনে ওয়াবীর আশ-শামেরী ।

২৪) সাত্তাম আবাল-খালে আদ-দোশারী ।

২৫) মোহাম্মদ ইবনে হা'জা ।

২৬) যায়েদ ইবনে যায়েদ (মোহাম্মদ ইবনে যায়েদের পিতৃব্য ভাই) ।

২৭) ফাহাদ ইবনে শোয়ায়েল আদ-দোশারী ।

২৮) ফিরোজ (যুবরাজের বডিগার্ড) ।

২৯) আব্দুল লতীফ আল-মা'শূক ।

৩০) ফারহান আল-সউদ ।

৩১) হাশাশ আল-আরজানী ।

৩২) মুতলাক আল-উজায়য়ান ।

৩৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আসকার ।

৩৪) মাজেদ ইবনে মুরাইদ আস-সুবাই ।

৩৫) আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান আল-হাযানী ।

৩৬) সা'য়াদ ইবনে ওবায়েদ ।

৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনে জারায়েস ।

৩৮) মা'দাদ ইবনে খারসান আশমেরী ।

৩৯) তাল্লাল ইবনে আজরাশ ।

৪০) সা'য়াদ ইবনে জীফান ।

৪১) ওবায়েদ ইবনে সালেহ আল-আওইবীল ।

৪২) হাতরাস আল-আরজানী ।

৪৩) আবদুল্লাহ আবু যায়েব আস-সুবায়ী ।

৪৪) শুয়া'য়ে ইবনে শাদদাদ ইবনে আল মোহাম্মদ আস-সুহায়েলী ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫) মোহাম্মদ ইবনে জামা'য়া ।

৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে জাত্তীলী ।

৪৭) ইব্রাহীম ইবনে আল-মুহীজাফ ।

৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে খানীরান ।

৪৯) মানছুর ইবনে ফারিজ ।

৫০) সালেম আল-আফিজাহ ।

৫১) ওবায়েদ (শুগু দুশারীর ভ্রাতা) ।

৫২) সুলতান (যুবরাজের চাকর) ।

৫৩) সা'য়াদ ইবনে ওবায়েদ ।

৫৪) মুতলাক ইবনে জীফান ।

৫৫) জায়েদ আল-ইফশী আস-সুবা'য়ী ।

৫৬) মুনাওয়াব আল ইজজী ।

৫৭) না'ফে আল-আলীওয়াবী ।

৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মুরাইদ আস-সুবা'য়ী ।

৫৯) মোহাম্মদ আল-মাশুক ।

৬০) নাসির ইবনে শামান ।

উপরোক্ত সদস্যগণ কুয়েত এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোক ছিলেন । ইবনে সউদ ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ইখওয়ান সংগঠিত করেন ।(৬) তিনি যে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভের পর অতি দ্রুত তাঁর রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মূলে ছিল ধর্মযুদ্ধে উদ্দীপ্ত ইখওয়ান সেনাদল । দ্বিধাহীন আনুগত্যের ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্রিত করেন ।(৭) তাঁহারা চরমপন্থী ওয়াহাবী হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন । ইখওয়ান দ্বারা শুধু দুর্ধর্ষ বেদুঈন গোত্রের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই তিনি সমর্থ হননি বরং আরব

Dhaka University Institutional Repository

বেদুঈনদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতীয় ঐক্য তথা আল মামলাকাতুল আরাবিয়া তুসসউদিয়া প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান।(৮) তিনি ইখওয়ানকে নির্ভরযোগ্য নাগরিকে পরিণত করার চেষ্টা করেন।(৯)

ইখওয়ান তাঁদের পশম নির্মিত তাবু ছেড়ে হুজরায় মৃত্তিকা নির্মিত গৃহে বসতি স্থাপন শুরু করেন। বেদুঈন জীবন থেকে স্থায়ী বসবাস, পশু পালনের পরিবর্তে কৃষি কাজ শুরু করেন।(১০) উৎপাদিত দ্রব্যাদি বেচাকেনা করতে গিয়ে অনেকে ব্যবসায়ী হন।(১১)

ইখওয়ান ইবনে সউদের বিজয় সমূহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে।(১২) আন্দোলন অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং অচিরেই একটি সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।(১৩)

ইখওয়ান নামের উৎপত্তি—

'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার জন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না'(১৪) ১৮:১৭।

আল-ইখওয়ান (الاخوان) অর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, ভ্রাতৃমন্ডলী। আল-ইখওয়ান আরবী শব্দ (الأخ) আল-আখ-এর বহুবচন। বর্তমান আরবদের মধ্যে উক্ত শব্দটি সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (اخوان) শব্দটি সাধারণভাবে পিতামাতা, স্বগোত্রীয়, ধর্মীয় অথবা পেশার ক্ষেত্রেও প্রচলিত।(১৫) নজদের স্বগোত্রীয়, ধর্মীয় এবং পূর্ব-শত্রুতা ভুলে গিয়ে নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতের প্রতি প্রেরণা স্বরূপ নিজেদেরকে ইখওয়ান বলে সম্বোধন করে।(১৬)

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর (ইখওয়ান) ভাই হয়ে গেলে"।(১৭) হাদিস সূত্রঃ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই'।

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ান আন্দোলন শুরু হয় নজদে।(১৮) এই আন্দোলনকারীগণ উগ্র হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী আব্দুল ওয়াহাব নজদী এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের ভক্ত ছিলেন।(১৯) তাঁর ভক্তগণ একটি ধর্মীয় ও সামরিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তী কালে ইখওয়ান ভ্রাতৃসংঘ নামে পরিচিত হয়।(২০) ইবনে সউদ ওয়াহাবী দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পর ওয়াহাবী পূনর্জাগরণ হয় ইখওয়ান ছত্রছায়ায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে সউদ সর্ব-প্রথম কৃষিকাজ বাসস্থান প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন আরতাবিয়ায়।(২২) এদের নামকরণ করা হয় 'ইখওয়ান' অর্থাৎ ভ্রাতৃসংঘ। গোত্রীয় রক্তের বন্ধনের পরিবর্তে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভ্রাতৃবোধ ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।(২৩) আরব ভূ-খন্ডে ১৯১২-৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইবনে সউদের শাসনকাল ছিল তাদের স্বর্ণযুগ।(২৪) এই আন্দোলনের মূল উৎস ছিল ওয়াহাবী মতবাদ। ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় চেতনা, সকল প্রকার গোত্রীয় দলাদলীর উর্দ্ধে উঠার প্রচেষ্টা, জেহাদী মনোভাব, ইসলাম প্রচারের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি বিষয়ে ইখওয়ান ও ওয়াহাবীদের মধ্যে সদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।(২৫) এই আন্দোলনকারীগণ তাদের অতীত জীবন যাত্রা ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ ইখওয়ানগণ তারা তাদের মস্তকাবরণের (গুত্রাহ) চার পাশে কাল রশির (ইকাল) পরিবর্তে পাগড়ী (ইমমাহ) ব্যবহার করতেন।(২৬)

হাফিজ ওয়াহাবা ইখওয়ানকে একটি বেদুঈন জনগোষ্ঠীরূপে বর্ণনা করেছেন। যারা বেদুঈন জীবন পরিহার করে, আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার অঙ্গিকার করেন।(২৭)

ইখওয়ান নামকরণের সঙ্গে হিজরতের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধু মাত্র ইসলামের মৌলনীতির জ্ঞানই কোন মানুষকে ভ্রাতৃত্ব (   ) লাভের যোগ্যতা প্রদান করেনা। এজন্য একজন মোমিনকে তার যাযাবর জীবন পরিত্যাগ পূর্বক নিজের পশু সম্পদ বিক্রয় এবং হিজরায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। মহানবীর (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় যে হিজরত ইসলামের যেমন - নব যুগের সূচনা করেছিল, তেমনি বেদুঈনদের হিজরায় প্রত্যাবর্তন ইখওয়ান আন্দোলনকে

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করে হুজারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল-রিহানী বলেন, "হুজার হলো হিজরার বহু বচন" অভিধানে হিজরার অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাসীদের মধ্যকার আবাসস্থল পরিত্যাগ করে ইসলামের জগতে প্রবেশ (২৮) ওয়াহাবা বেদুঈন ও হিজরার ধারণাকে সমন্বিত করে ইখওয়ানের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেনঃ ইখওয়ান বলতে একটি বেদুঈন জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা তাঁবুর আবাসস্থল পরিত্যাগ এবং মাটির ঘরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এই হুজরাই হচ্ছে একটি নিদর্শন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা তাদের অবাঞ্ছিত জীবনের পরিবর্তে অধিকার প্রিয় ও বাঞ্ছিত জীবন গ্রহণ করেছে (২৯)

ইখওয়ানের উদ্দেশ্য—

মক্কার শরীফ হুসাইন ও ইবনে সউদ উভয়ে বৃটিশের অর্থ ও সাহায্য গ্রহণ করেন (৩০) শরীফ হুসাইন প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে সউদকে পরাজিত করতে বৃটেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন

ইবনে সউদ বৃটিশের অর্থ ও সাহায্য গ্রহণ করেন তিনি ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে ইখওয়ান নামে একটি সুসংগঠিত ধর্মীয় যোদ্ধার দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (৩১)

ইখওয়ান ওয়াহাবী আন্দোলনে সহায়ক শক্তিরূপে গড়ে ওঠে এর মাধ্যমে বেদুঈনরা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বাস ও কৃষিকাজ করার প্রেরণা পায় (৩২) এই উদ্দেশ্যে ইবনে সউদ তাদের জন্য হুজরা নামক বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা নেন (৩৩) হুজরাকে সামরিক শক্তিরূপে ব্যবহার করেন

নিম্নরূপ-

১ ধর্ম প্রচার;

২ সেবামূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সৌদী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়তর করা

ইবনে সউদ জন্মগতভাবে শহরবাসী ছিলেন কিন্তু তিনি বেদুঈনদের মধ্যে অনেক দিন বসবাস করেন এবং তাদেরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পান

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় গোত্র কলহে জড়িয়ে বেদুঈনরা যুগ যুগ ধরে আরবদেশকে বহুধাবিভক্ত করেছিল। তাই তিনি এমন একটি পন্থার উদ্ভব করেন যার দ্বারা বেদুঈনদের প্রতিভা কোন ভালকাজে ব্যবহার করা যায়। এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিভিন্ন হুজরায় একত্র করে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।(৩৫) এভাবে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ দ্বারা একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়।(৩৬) এই বৈপ্লবিক পদ্ধতি বেদুঈনদেরকে পুরাতন জীবন পদ্ধতির অবসান ঘটায়।(৩৭)

সরকার এই সমস্ত হিজরা নির্মাণের স্থান নির্ধারণ, জমি বরাদ্দ, মসজিত নির্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বাসগৃহ তৈরীর ব্যবস্থা করেন। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে জরুরী উপদেশ ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা নেন।(৩৮) ধর্মীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষক প্রেরণ করতঃ হিজরা প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে সাহায্য সহযোগিতা দান করেন।(৩৯)

ইখওয়ান নীতিমালা—

একজন ইখওয়ান সদস্যের সর্বপ্রথম দু'টি জিনিষের প্রয়োজনঃ-

১। এক আল্লাহর ইবাদত করা;

২। সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ উদ্রেক করা। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দুটি ভাগ ছিল-

প্রথমত-

(১) এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা।

(২) যাকাত প্রদান করা।

(৩) রমযান মাসের রোজা রাখা।

(৪) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

(৫) মক্কা শরীফে হজ্জব্রত পালন করা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত-

(১) একমাত্র দেশকে ভালবাসা।

(২) ইমাম ইবনে সউদের আনুগত্য স্বীকার করা।

(৩) এক মুসলিম ভাই অপর ভাইয়ের সাহায্যে আসা। তা অর্থনৈতিক বা অন্য কোনভাবেই হোকনা কেন।

ইখওয়ানের সংগঠন—

ইখওয়ানের অসাধারণ কর্মদক্ষতা সাহসিকতা ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার বদৌলতে আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইমাম ইবনে সউদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

ইখওয়ান সংগঠনের(৪১) প্রথম প্রতিষ্ঠিত 'হিজরা' বা বাসস্থানের নাম আরতাবিয়া।(৪২) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৩০ হিজরীতে নজদ প্রদেশের আব-যিলফী নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে কুয়েত হতে কাসিম প্রদেশে গমনাগমনের পথে এই হিজরা স্থাপিত হয়েছিল।(৪৩)

১৯১২ সালে যখন ডেনিশ পর্যটক BARCLARY RAUNKIEER উক্ত কূপের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন তখন তিনি সেখানে কোন হুজরা নামক বাসস্থান দেখতে পাননি।(৪৪) ফিলবীর মতে ১৯১২ সালের প্রথম অথবা শেষের দিকে এই স্থানটি একটি শহরে রূপান্তরিত হয়। যার অধিবাসী ছিল কমপক্ষে ১০ হাজার। অল্প দিনের মধ্যে লোক সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারে উন্নীত হয়।(৪৫) মুতায়র ও হারব গোত্রের লোকদের নিয়ে নুতন হুজার গড়ে উঠছিল। মুতায়র গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা ফয়সাল আদ-দুবেশ তাদের নেতা নির্বাচিত হয়। আমিন রিহানী একে 'ইরতাবিয়া' রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয় হিজরাটি আল-গাতগাত। যা রিয়াদের দক্ষিণ পশ্চিমে জাবালে তুওয়ায়ক এর পাদদেশে অবস্থিত ছিল। মূল অংশ গঠিত ছিল আল-উতায়বা গোত্রের লোকজন দ্বারা। বাকি অংশ বারকা অধিপতি সুলতান ইবনে বিজাদ

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে হুমায়েদ-এর অধীনে ছিল। তিনি ধর্মীয় প্রবক্তা হিসেবে ইবনে হুমায়েদ সুলতানুদ্দীন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। হিজরাবাসীদের মধ্যে যারা বলিষ্ঠ ছিল তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। একই সঙ্গে তারা কৃষি কাজে লিপ্ত ছিল। তাদেরকে উৎপাদন বাড়ানো ও সম্পদ আহরণে উৎসাহিত করা হতো। এভাবে ওয়াহাবী আন্দোলন শক্তিশালী করা হয়।(৪৬) আমিন রিহানী হিজরা এবং সেখানকার অধিবাসীদের গোত্রভিত্তিক সংখ্যার আরেকটি তালিকা প্রদান করেছেন।(৪৭) উম্ম আল-কুরা ও আলমানা গোত্রের নাম হুজারও আমীরের নামের তালিকা প্রদান করেছেন।

হুজারবাসী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলঃ- (ক) বেদুঈন (খ) মুতাওবী নামে অভিহিত প্রচারকবৃন্দ এবং (গ) বার্কারা ব্যবসায়ী শ্রেণী। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তাদের শ্রেণী বিন্যাস ছিল নিম্নরূপঃ-

ক) স্থায়ী মুজাহিদ বাহিনীঃ যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে জেহাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য এরা প্রস্তুত থাকতো।

খ) সংরক্ষিত বাহিনীঃ শান্তির সময় এরা পশু পালনের শ্রমিকরূপে কাজ করতো আর যুদ্ধের সময়ে জিহাদে গমনে বাধ্য থাকতো।

গ) সাধারণ নাগরিকঃ এই শ্রেণীর লোকেরা শান্তির সময় হুজরায় কৃষিকার্য ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতো। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তারা ও যুদ্ধে যোগদান করত।

প্রথম দুই শ্রেণীকে শাসনকর্তা যে কোন সময় যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানাতে পারতেন কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ নাফীর বা সাধারণ নাগরিকদেরকে যুদ্ধে যোগদানে আহ্বানের জন্য এই মর্মে ওলামা শ্রেণীর অনুমতির প্রয়োজন হতো।(৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গ—

১। শায়েখে মুহাম্মদ ইবনে সালিক আল-উথাইন আজমান গোত্রের মিসরা শাখার।

২। ফয়সরল আদ-দুবেশ উতায়বা গোত্র।

৩। আব্দুল আজিজ, ফয়সল আদ-দুবেশের পুত্র।

৪। শুয়াইয়ান আবু জুমা'য়া আজাম গোত্রের মাহফুদ শাখা।

৫। ফারহান ইবনে মাশহুর আল-সা'য়ালান রুয়ালা গোত্র আনিজাহ শাখা।

৬। আল-দাহিনা, উতায়বা গোত্র।(৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

গোত্র, হিজরা ও আমীরের নামসহ তালিকা নিম্নরূপ(৫০)

গোত্র	হিজরা	আমীর
উতায়বা	নাফী	উমার ইবেন রুবায়'যান
	আল-দাহনা	গাজী আল-বারাক
	উসায়লা	গাজী আল-থাম
	আরজা	কাতিম আল-হালীল
	সাজির	নাসির ইবনে মুহাই
	আল হায়েদ	আকাদ ইবনে মুহাই
	মুসাদাহ	খালিদ ইবনে জামি
	আল রুওয়েদাহ	জামাল আল-মিহার
	আবু জালাল	মাহমাস আল-তাহগার
	আল-রওদাহ	মজিদ ইবনে দাহবি ইবনে ফুহায়েদ
	আল-লাবিব	আবদ আল-মুহাসিন
	আল-হুফায়রাহ	সাজদি আল-হায়দিল
	সানাম	সুলতান আরা আল-আলি
	আরওয়া	জায়জায় ইবনে হুমায়েদ (সুলতানের ভ্রাতা)
	আল কারারা	সুলতান আবু সানাম
	কালসান	সুলতান আবু খায়সীম
	সুবায়ঈমা	নাসির ইবনে বাজিন
	আল-কারায়েন	খাতিব ইবনে মাসাদ
	আলসুহ	সুলতান আল-গাদবা

Dhaka University Institutional Repository

আমিন রিহানী হিজরা সমূহ(৫১) এবং উহার অধিবাসীদের গোত্রভিত্তিক সংখ্যার নিম্নরূপ তালিকা প্রদান করেছেনঃ

গোত্র	শহরের নাম	লোকসংখ্যা
মোতায়ের	আল-আরতাবিয়া	২০০০
	আমনায়েদ	১০০০
	ফ্রাসিয়ান	১০০০
	মুলাইহ	৭০০
	আল-ইমার	৭০০
	আল ইতলাহ	১০০০
	আল-ইবতাবী	৬০০
	মিসকাহ	৮০০
	দুরাইয়া	৮০০
	আস-সাঈব	৪০০
	ক্বারিয়া (উচ্চ)	১৫০০
	ক্বারিয়া (নিম্ন)	১০০০
	সুদায়ের	৭০০
	নুখায়ের	৭০০
	মোন মোতায়র	১০০০
	মোট ঃ	১৩,২০০

Dhaka University Institutional Repository

উতায়বা গোত্রের রুকয়া শাখা

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
গাতগাত	২০০০
আদ-দাহনা	২০০০
আস-সাওয়া	৩০০
সাজের	৮০০
আজরা	২০০০
উসায়লাহ	৩০০
নাফী	১৫০০

উতায়বা গোত্রের বারকা শাখা

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
উরওয়া	১০০০
আস-সানাম	১০০০
আর-রাওদ	৭০০

হারব গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
দুকনাহ	২৫০০
আস-সুরায়কিয়াহ	১০০০
আদ-দুলায়মিয়া	১০০০
আল-কাওরীন	৭০০
আস-সাদিকাহ	৬০০
হুলায়ফা	৩০০
হুনায়যাল	৭০০
আল-বুরাউত্ত	১০০০
কিবাহ/জাবা	২০০০

Dhaka University Institutional Repository

শাম্মার গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আল-জাফর	২০০০
রোদহুল উয়ায়ুন	১০০০

হুতায়ম

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
বিনওয়ান	১৫০০

আদ-দুয়াশীর গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
মুশায়রীকা	১৫০০
আল-উসায়তাহ মোট দুয়াশির	৮০০
	২৩০০

আল-উজমান গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আস-খীরার	২০০০
হুযায়েজ	১০০০
আস-সীহাফ	৮০০
আল-উজায়ের	৭০০
উরায়রাহ	১৩০০

Dhaka University Institutional Repository

আল-কাহতান গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আল হায়াতীম	১৮০০
আল-জুফায়ের	৩০০
আল হিসাত	৮০০
আর-রায়ান উচ্চ	২০০০
আর-রায়ান নিম্ন	২০০০
	৬৯০০

খারজ গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আদ-দুবানিয়া	৮০০
আল-বিদা	৮০০
আল-মুনাসীফ	৬০০
আল-আখজার	৫০০
তাইবিজাম	৪০০
আর-রুওয়াদাহ	৪০০

আল-আওয়াজীম গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
তাজ	১৫০০
আল-হাসী	১০০০
আল-হায়াত	১০০০
আল-আতিক	৭০০

Dhaka University Institutional Repository

বনু মুররাহ গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
বেনাক	১০০০
উবায়রীক	১৫০০

বনু হাজীর গোত্র

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আইনদার	১০০০

জন এস হাবীব ২২২টি হুজরার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।(৫২) বৃটিশ পাবলিক রেকর্ড অফিস, আরবী পান্ডুলিপি, ঐতিহাসিক দলিল এবং সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনা থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের দ্বারা পরিচালিত হুজরার সংখ্যা নিম্নোক্ত তালিকা পাওয়া যায়।

শহরের নাম	লোকসংখ্যা
ইয়াম	১
মুতায়র	২৭
উতায়রা	২৫
হারব	৩৮
শম্মার	২৩
দলক্ব	৭
হুতায়ম	৬
কাহতান	১১
দুয়াশীর	৪
আজমান	১৯
আওয়াযীম	৪
খারজ এলাকা	৫
বানী হাজীর	৫
	১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ভারক হোপউড ২০০ হুজরার উল্লেখ করেছেন।(৫৩) হুজরা সমূহ সামরিক, সরবরাহ ও ধর্মীয় ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করতো।(৫৪)

সামরিক বৈশিষ্ট্য —

১৯১৫ সালেই 'ইখওয়ান' জিরাব যুদ্ধে সমিরিক শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।(৫৫) শরীফ হোসাইন হেজাজে তাঁর নিয়মিত ও সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এরা তুরস্ক ও বৃটেণে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল। আরবের উত্তর দিকে রশিদী শাসনাধীন শাম্মার গোত্রের সদস্যরা তুর্কী সামরিক সরঞ্জাম দ্বারা হোসাইন বাহিনীর সহযোগিতা করছিল। নজদ উপকন্ঠে ইবনে সউদ মিশ্র সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। উহা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলঃ-

ক) *আরিদার জনগণঃ* এরা সউদী রাজ পরিবারের অত্যন্ত অনুগত ও সমর্থক ছিলেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ খুঁটি। উহারা রিয়াদের স্থানীয় বাসিন্দা এবং সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তারা রাজ পরিবারের সদস্যের অংশ বিশেষ ছিলেন।

খ) *শহুরের বাসিন্দাঃ* এরা নজদের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রতি হুজরায় তারা বছরে চার মাস সামরিক সরঞ্জামসহ অবস্থান করতো। তারা মূলত কৃষক ও বণিক হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন হুজরায় অবস্থান না করে পর্যায়ক্রমে বসবাস করতো। এদের রসদাদি বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করা হতো। যুদ্ধ না থাকলে তারা বায়তুল মালে লেভী হিসাবে অর্থ যোগান দিত।

গ) *খেওয়ানঃ* এরা যুদ্ধের জন্য হুজরায় সর্বদা সতর্কাবস্থায় থাকতো। তারা নৈমিত্তিক কৃষক বা বণিক ছিল না। যেমন হদর (শহরবাসী) ছিল। তারা ছিল আত্মনিবেদিত প্রাণ। অনুমতিক্রমে অসুস্থতা ব্যতিত কেহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে অন্যদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হত্যা করা হতো।(৫৬) ১৫ বছর বয়সের যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হতো।(৫৭) ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো।(৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) *বেদুঈনঃ* বিভিন্ন গোত্রের ভিন্ন মতাবলম্বী। যারা হুজরায় বসবাস স্বীকার ও ইখওয়ানে পরিণত এবং বেদুঈন অনুগত ও ওয়াহাবী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হলো।(৫৯) উভয়ের বৈশিষ্ট্য হলো এরা মূলত বেদুঈন। এরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। উহায়া শরীফ হোসাইন ও রশিদী সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে আধুনিক গেরিলা বাহিনী হিসেবে নিয়োজিত ছিল।

শহরবাসীগণ সাধারণভাবে ওয়াহাবী মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তারা বেশী সংখ্যায় ইখওয়ানে যোগদান করেনি। সাধারণত বেদুঈনগণই এর সদস্য হয়।(৬০)

ইখওয়ানরা নিম্নরূপ সামরিক আক্রমণ চালাতোঃ

১। *আল-সাবাহঃ* উহা তাসবীহ নামেও পরিচিত। সূর্যোদয়ের পূর্বে আক্রমণ চালাতো।

২। *আল গাহরাঃ* আল-লাকওয়া নামেও পরিচিত। যখন পূর্বাহ্নে আক্রমণ করতো। এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী সেনাবাহিনী দ্বারা হতো যখন শত্রুর ভয় থাকতো না।

৩। *আল রুহাহঃ* তারাবীহ নামেও পরিচিত। এ আক্রমণ অপরাহ্নে করা হতো, যখন সামরিক শক্তি আল সাবাহর অনুরূপ থাকতো।

৪। *আল হিজাদঃ* আল মুহজাদ নামেও পরিচিত। এই আক্রমণ সূর্যাস্তের পর পরবর্তী ভোরের যে কোন মুহূর্তে করা হতো। এ আক্রমণ অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ রাতের অন্ধকারে শত্রু ও বন্ধু পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য ছিল। চৌকস সমরনেতা ছাড়া এ পদ্ধতির আক্রমণ করা হতো না। ইবনে সউদ এ প্রক্রিয়ার যুদ্ধে নিজে অংশ গ্রহণ করেন তা ছিল রওদার যুদ্ধ জিলফী ও বুরায়দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইখওয়ান সদস্যরা তারাবা যুদ্ধে এরকম ভয়াবহ প্রক্রিয়ার আক্রমণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।(৬১)

১৩৩৬/১৯১৮ সাল নাগাদ ইখওয়ান সামরিক সংগঠন এই পর্যায়ে ছিল যে, এরা ইবনে সউদের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর সদস্যরূপে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

পতাকাসহ দেহরক্ষী দলের সাথে শোভাযাত্রা করতো।(৬২) এরা নজদবাসীদের স্থান দখল করে।

সৈনিক হিসেবে ইখওয়ান নিজদেরকে তাওহীদের বীরযোদ্ধা এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের ভাই বলে আখ্যায়িত করতো। এরা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করার আকাংখা পোষণ করতো। তাদের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আহ্বান এই রকম ছিলঃ

জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে;

ওহে তোমরা কোথায় যারা জান্নাতের জন্য লালায়িত।(৬৩)

আমি ঐক্যের বীরযোদ্ধা;

যারা আল্লাহর অনুগত তাদের ভাই।

হে শত্রুরা তোমরা তোমাদের মস্তক প্রদর্শন কর।(৬৪)

ঐক্যের জনগণ। ঐক্যের জনগণ।

রিয়াদের জনগণ। রিয়াদের জনগণ।(৬৫)

আল-মাদানীর রেকর্ড অনুসারে অধিক উচ্চাভিলাসী ইখওয়ানের সামরিক সংগঠনকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ-

১। *উত্তর পূর্ব সেক্টরঃ* ইরাক সীমান্ত বরাবর- এর প্রধান ঘাঁটি লিনা এবং উন্ম আল রদমাহ;

সেনা প্রধানঃ ইবনে জাবরীল এবং ইবনে হুনয়ান।

২। *উত্তরা পশ্চিম সেক্টরঃ* সিরিয়া সীমান্ত বরাবর- প্রধান ঘাঁটি আল যুবা;

সেনা প্রধানঃ ইবনে আকিল এবং ইবনে দুগমা।

৩। *উত্তর হেজাজঃ* মদিনা রাইন সংলগ্ন হেড কোয়ার্টার দাখনা এবং তিমাহ; সেনাপ্রধানঃ ইবনে নাহিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪। *দক্ষিণ হেজাজঃ* মক্কা লাইন সংলগ্ন হেড কোয়ার্টার আল খুরমা;

সেনা প্রধানঃ খালিদ ইবনে লুয়াই।

৫। *রিজার্ভ ব্রাঙ্গঃ* আল আরতাবিয়া:

সেনাপ্রধানঃ ফয়সল আদ-দুবেশ।(৬৬)

১৫, ডিসেম্বর ১৯২৮ হতে ৩, মার্চ ১৯২৯ পর্যন্ত ইখওয়ান আক্রমণকারী দলসমূহের কার্যাবলী বৃটেনের পাবলিক রেকর্ডে সংরক্ষিত তথ্য(৬৭) অনুসারে নিম্নরূপঃ

১। আল-জুমায়মাহ এলাকায় মুতায়র আক্রমণকারী দলসমূহঃ

নেতা	শক্তি
আল-মুরায়েকহীক	৩০ জন মানুষ, ১৬টি উট
জাতালি ইবনে রশিদ	২০ জন মানুষ, ১৫টি উট
ইবনে গানাইম	৮ জন উট চালক
ইবনে রুশদান	প্রায় ৩০ জন
মানাহি ইবনে আসওয়ান	১৫০ উট চালক
লাফি ইবনে মু'আল্লাত	প্রায় ৩০ উট চালক

২। কুয়েতে উজ্জমান এবং মুতায়র আক্রমণকারী দলসমূহঃ

নেতা	শক্তি
দিদান ইবনে হিসলায়েন	২০০ জন
ইবনে হিসলায়েন (আজমান)	-
ইবনে সুকায়ের (মুতাইর)	-

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আল ফাগম (মুতাইর)	১০০০ জন
ইবনে সুকাইর (মুতাইর)	২০০ জন
ইবনে ফাগম (মুতাইর)	-
ইবনে সুকাইর	-
ইবনে ফাগম	৬০০ জন

৩। হাজজুল এলাকায় উতায়বা আক্রমণকারী দল সমূহঃ

নেতা	শক্তি
মোঃ ইবনে জাবরিন	৮০০ জন
মুহাসিন	১০০০ জন
সুলতান ইবনে হুমায়েদ	১২০০ জন

আমিন রিহানী ইখওয়ান সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৭৫,০০০ বলে তথ্য পেশ করেছেন। এর দ্বিগুণ ১,৫০,০০০।

ইখওয়ান সম্প্রসারণ —

ইখওয়ান হিজরা সমূহ নজদ প্রদেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল নজদে। নজদ বর্তমান সউদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ। দক্ষিণ দিকে উহারা আররুব-উল-খালীর শেষ প্রান্তে সম্প্রসারিত হয়। পশ্চিম দিকে সিরীয় মরুভূমির নিকটতম অঞ্চলে পৌছায়। উত্তর দিকে আল হিজাজ, আসীর এর উচ্চ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তার ঘটায়।(৬৮)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. Jacques Benoist-Mechin, ArabianDestiny, Translated from the French by Denis Weaver, London, Elek Book Limited, 1957, P. 95.

২. Ibid., P. 118.

৩. H.R.P. Dickson, Kuwait and Her Neighbors, London, George Allen an dUnwin Ltd. Ruskin Hosue Museum Street, 1956, P. 149.

৪. Fouad Al-Farsy, Modernity and Tradition, Knight Communications Ltd., London, 1992, P. 17. এবং ডঃ মাদীহা আহমদ দারবেশ, তারিকুদ দাওলাতিস সাউদিয়া, জামেয়ায়ে আল মালেক আব্দুল আজিজ, রিয়াদ দারুশ শুরুফ, ১৯৭৮, পৃঃ ৯৩ ।

(الدكتور مديحه احمد درويش - تاريخ الدولة السعودية، بجامعة الملك عبد العزيز-برياض، دار الشرف- ١٩٧٨، ص٩٢)

৫. ডঃ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল আবুদ, আকিদাতুশ শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদিল ওয়াহাব, আস-সালাফিয়াত ওয়া আচারুহা ফিল আলামিল ইসলামিয়াহ আলা মালাকাতুল আরাবিয়াতুস সউদিয়াহ আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়াহ বিল মদীনাতিল মুনতিয়ারাহ সউদী আরবঃ ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী, পৃঃ ৬০৯।

الدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العيود - العقيدة الشيخ- المملكة العربية السعودية الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٨ه، ص/٦٠٩

৬. Mohammad almana, Arabia Unified, London: Hutchinson Benham, 1980, PP. 274-75.

৭. Muhammad Asad, The Road to Mecca: London, Max Reinhardt, 1954, P. 174.

৮. Desek Hopwood, The Arabian Peninsulea, London, 1972, P. 64.

৯. ডঃ সালেহ, প্রাগুক্ত, ৬০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. সালাহুদ দীন আল-মুখতার, তারিখুল মামলাকাতুল আরাবিয়াতুস সউদিয়াহ ফিমাজিহা হাজেরাহা, ১ম সংস্করণ, চররুত দারে মকতবাতে হায়াত, ১৯৫৮, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।
(صلاح الدين مختار ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، دار مكتبة الحياة - بيروت ١٩٥٨ ، ص/١٤٥-١٤٤)

১১. আহমদ আবদুল গফফুর আত্তার, ছকরুল জাযীরাহ, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, জেদ্দা, আল-মুয়াসসাসিয়া আল-আরারিয়া লিল তিবায়াহ, ১৯৬৪, পৃঃ ১৯৯।
(احمد عبد الغفور عطار صقر الجزيرة - الجزء الاول الطبعة الثانية جدة: الموسسية العربية للطبعة ١٩٦٤م ، ص١٩٩)

১২. Asad, op. cit. P. 174.

১৩. Hopwood op. cit. P. 64., সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

১৪. আল-কুরআন, ১৮ঃ১৭ Muhammad Almana, Arbia Unified, London, 1980, P. 77.

১৫. মাজমা আল-লুগাতুল আরাবিয়া মাজাইম আলফাজ আল-কুরআনুল কারীম, মিশরঃ আল-মাতাবাউল আমীরীয়া, ১৯৫৩, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০।
(مجمع اللغة العربية معجم الفاظ القران الكريم- القاهرة المطبع الاميرية- ١٩٥٣، المجلد الاول ص/ ٣٠)

১৬. মাজাল্লাতুদ দারাসাত, আল-খালিজ ওয়াল জাযীরাতিল আরব, জিলহজ্জ ১৩৯৫ হিজরী, জানুয়ারী ১৯৭৬, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১২।
(مجلة درسات الخليج والجزيرة العربية العدد الخامس السنة الثانية - كانون ثاني (يناير) ١٩٧٦- ذو الحجة ١٣٩٥ه ، ص/١٢

১৭. আল-কুরআন, ৩ঃ১০৩।

১৮. "The Ikhwan of Najd area Phenomenon of Central Arabia and should not be confused with the Muslim Brotherhood known as the Ikhwan al-Muslimin which arose in Egypt.", John. S. Habib Ibn Sauds Warriors of Islam, Netherland, E.J. Brill Leiden, 1978, P. 16.

১৯. মাজাল্লাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

২০. Benoist, op. cit. P. 123.

২১. Almana, op. cit. P. 80.

২২. Ibid. P. 81, Also see Asad op. cit. P. 174.

২৩. Sir. J.B. Glubb, Britain and the Arabs, London, 1959, P. 209.

২৪. Encyclopaedia Britanica, vol 5, London, P. 298.

২৫. রিনাল্দহাইকিরনান, কাশফুন নেকাব আনিল জাযীরাতিল আরাবিয়া, লন্ডন: George C. Harriet & Co. Ltd, 1937, পৃঃ ২৯০।
(رينالد هيوكيرنان – كشف النقاب عن الجزيرة العربية – لندن: جورج هاربيت اند كو ليمند – ١٩٢٧م ، ص/٢٩٠)

২৬. মাজাল্লাত আদ্দারাসাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৭. হাফেজ ওয়াহবাহ, আল-জাযীরাতিল আরব ফিল করনিল ইশরীন, কায়রো, মাতবায়াহ আল-নাহদাত আল-মিসরিয়া, ১৯৬১, পৃঃ ৩০৯।
(حافظ وهبه – جزيرة العرب في قرن العشرين : القاهرة : مطبع الهندة المصرية١٩٦١م ، ص/٣٠٩)

২৮. আল-রিহানী, নজদ ওয়া মুলহাকাতিহ, বৈরুত, দারুর-রিহানী, ১৯৬৪, পৃঃ ২৬১।

২৯. ওয়াহবাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩।

৩০. Robert Lacy, The Kingdom, London, 1981, p. 182.

৩১. Howarth David. the Desert King, London, 1964, P. 104.

৩২. Benoist, op. cit. P. 116.

৩৩. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৩৪. Almana, op. cit. P. 81.

৩৫. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৮।

৩৭. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।

৩৮. Hafiz Wahbah, Arabian Days, London, Arthur Barker Ltd., 1964, PP. 132-33.

৩৯. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬-৪৭।

৪০. Dickson, op. cit. P. 154.

৪১. Asad, op. cit. 174, আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৯।

৪২. H. St. John Philby, Arabia of the Wahhabis, London, 1928, P. 352.

৪৩. Lorime, Gazetter of the Persian Gulf, Vol II, 1908, P. 1313.

৪৪. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৯।

৪৫. Philby Loc, cit. P. 352.

৪৬. Lacey, op. cit, P. 145.

৪৭. Ameen Rihani, Ibn Saud of Arabia: His people and his land, London: Constable & Co. Ltd. 1928, PP. 198-99.

৪৮. মাজাল্লাতুদ দারাসাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

৪৯. H.R.P. Dickson, the Arab of the Desert, London, George allen and Unwin Ltd., 1949, PP. 350-61.

৫০. Umm Al-Qura, number 292, (11 July 1930).

৫১. Rihani, op. cit. PP. 198-99.

৫২. John. s. Habib, Ibn Sauds Warriors of Islam, Netherland, 1978, P. 58.

৫৩. Hopwood, op. cit. P. 64.

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. ফুয়াদ হামযা, ক্বালব জাযীরাত আল-আরব, কায়রো, আল-সালাফিয়া প্রেস, ১৯৩৩, পৃঃ ৩৭৮।

فواد حمزة - قلب جزيرة العرب ، القاهرة - السلفية قرس، ١٩٣٣م ، ص/٢٧٨

৫৫. H.C. Armstrong, Lord of Arabia, Beirut, Khayats, 1966, P. 88.

৫৬. উমন-আল-কুরা, মক্কা, সংখ্যা ২৯১ (৪ঠা জুলাই ১৯৩০)

صحيفة ام القري، مكة المكرمة - ١٩٣٠م

৫৭. S. Habib op. cit. P. 54.

Interview with the governor of Al-Artawiyah in that town, March, 1968.

৫৮. উম্ন, আল-ক্বুরা, সংখ্যা ২৮৭ (৬ই জুন, ১৯৩০)।

৫৯. W.F. Smalley, "They wahabis and Ibn Saud", The Moslem world, Vol 22, No. 3, July, P. 245.

৬০. Ibid., 6 Rajab, 1347 A.H.

৬১. উম্ন-আল-ক্বুরা, সংখ্যা ৩০২, (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)।

৬২. Encyclopaedia Britanica, vol-v, Founded 1768, 15th Edition, William benton, Publish, 1943-1973, London, P. 298.

৬৩. ওয়াহবাহ, আল-জাযীরাত, পৃঃ ২৯৫

৬৪. আমীন রিহানী, মুলুক আল-আরব, বৈরুত, দার-আলরিহানী লিল ওয়াল নস্থর, ২য় খন্ড, ১৯৬০, পৃঃ ৮২।

امين الريحان - ملوك العرب ١٩٦٠، المجلد الثاني ،ص/٨٢

৬৫. ঐ, পৃঃ ২২২।

৬৬. মুহাম্মদ মুগায়রাবী আল-মাদানী, ফিরকাঃ আল ইখওয়ান, আল-ইসলামিয়া বিনাজদ, ১৯২২, পৃঃ ৪৩-৪৫

محمد المغربي المدني - فرقات الاخوان الاسلامية بنجد - ١٩٢٢م، ص/٤٥-٤٣

৬৭. Summary of Ikhwan raiding parties, Public Record office, Landon, MSS, F.O. 371-13714, Document No. E 1781 (1929).

৬৮. D. Vander Meulen, The Wells of Ibn Saud, New York, Frederik A. Praeger, 1957, P. 66.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের সঙ্গে ওয়াহাবীগণের ও ইবনে সউদের সম্পর্ক

আধুনিক সউদী আরবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ওয়াহাবী মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ তাঁর পূর্বকার মুহম্মদ ইবনে সউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। একই সঙ্গে তিনি ওয়াহাবী মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

ইখয়ানের সঙ্গে ইবনে সউদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের সময়ই আরবের উত্তর ও পশ্চিম দিকে রাজ্যের বহু বিস্তৃতি লাভ করে। আসীর জাবাল শাম্মার এবং আল-হেজাজ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৮৭) প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনকারী সম্প্রদায়ের নাম ওয়াহাবী। দারিয়ার শাসক মুহাম্মদ ইবনে সউদ তাঁর চিন্তা ধারা গ্রহণ করেন এবং উহার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব নেন। শাসন কর্তৃত্ব ইবনে সউদের হস্তে ন্যস্ত থাকলে ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব ধর্মীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন। দুই জনের মধ্যে ইহাই সম্পর্কের প্রকৃত কারণ। এই সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ইবনে সউদের বংশধরগণ ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ইবনে সউদ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব-পুরুষদের ওয়াহাবী মতবাদ গ্রহণ করেন।(১)

ইখওয়ান আন্দোলন একই সঙ্গে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রসার ঘটায়। একটি নতুন সামরিক শক্তির উত্থান হয়। তাঁরা চরমপন্থী ওয়াহাবী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।(২) ইখওয়ান আন্দোলনকে প্রাথমিক যুগের ইসলামী জেহাদের একটি অসম্পূর্ণরূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এরা বিভিন্নভাবে সনাতন বিশ্বাস ও পদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্বাসী ছিল। ওয়াহাবীরা সালাফিয়া বা আদিম পন্থীরূপে পরিচয় দিতে ও পছন্দ করেন।(৩)

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখওয়ানের সাহায্যে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যখন সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন তার মূলে ওয়াহাবী মতবাদ সক্রিয় ছিল। ওয়াহাবী মতবাদ যখন উদ্ভব হয় তখন এর মূলনীতি ছিলঃ

সূচনায় ওয়াহাবী মতবাদ নিম্নরূপ ছিলঃ

১। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ইবাদত অলীক ও মিথ্যা। এরূপ মিথ্যা উপাস্যকারী হত্যার যোগ্য।

২। অধিকাংশ মানুষই মুওয়াহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় - কারণ তারা ওয়ালী দরবেশদের কবর যেয়ারতের দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং তাদের কার্যকলাপ কুরআনে বর্ণিত মক্কার মুশরেকদের ক্রিয়াকর্মের অনুরূপ।

৩। দো'য়ার সময় কোন নবী, ওয়ালী, পীর বা ফেরেশতার নামের অবতারণা করা শিরক বা অংশীবাদীতার নামান্তর।

৪। আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারো সাহায্য প্রার্থনা করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

৫। আল্লাহ ছাড়া কাহারো নামে শপথ করা শিরক।

৬। আল-কুর'আন সুন্নাহ এবং যুক্তিমূলক কিয়াসের বিত্তি ছাড়া অন্য কোন প্রকার ইলমের স্বীকৃতি ব্যক্ত করা কুফরের শামিল।

৭। সমুদয় কাজে তাকদীরের অস্বীকৃতি কুফর এবং ইলহাদ অর্থাৎ অবিশ্বাস ও

Dhaka University Institutional Repository

অধর্মাচরণের নামান্তর।

৮। তাবীলের (মনগড়া ব্যাখ্যা) সাহায্যে কুর'আনের ব্যাখ্যা করা কুফরের পর্যায়ভুক্ত।

আহমদ ইবনে হাম্বলের মতবাদের সঙ্গে ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের মতবাদের নিম্নলিখিত পার্থক্য ছিলঃ

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের মতে-

১। ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আহম্মদ ইবনে হাম্বলের নিকট উহা ফরজে আইন। ইবনে তাইমিয়ার নিকট নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাতে নামাজ পড়া শর্ত।

২। তামাকের ধুমপান হারাম। কেহ পান করলে অনুর্ধ চল্লিশ বেত্রাঘাত দিতে হবে।

৩। গোপন মুনাফার জন্য ও যাকাত দিতে হবে। যেমন ব্যবসায় - বাণিজ্যের লাভ। কিন্তু আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) শুধু প্রকাশ্য উৎপাদন হতে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪। ইসলামের মর্মবাণী কালেমা-ই-তাইয়েবা শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই কোন লোক মোমিন বলে গণ্য হবে না।

ধর্মীয় কাজ-

এস, জুইমার ওয়াহাবী মতবাদের যে পরিচয় তালিকা প্রদান করেছেন তার সাথে উপরোক্ত তালিকার কোন পার্থক্য নেই। উপরন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও তাতে রয়েছেঃ(৬)

১। তাঁরা জেকেরের জন্য তাসবীহের মালা ব্যবহার নিষেধ করেন। তৎপরিবর্তে আল্লাহর নাম এবং দোয়া দুরুদ নিজ নিজ হস্তাঙ্গুলের গ্রন্থিতে তাঁরা গণনা করে থাকেন।

২। ওয়াহাবীদের মসজিদ সমূহ অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর ধরনের নির্মাণ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। তাতে কোন মিনার সংযুক্ত কিংবা কোনরূপ সাজসজ্জার চাকচিক্যময় করতে দেওয়া হয় না।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের সমসাময়িক কালে আরও প্রচলিত শিরকমূলক চালচলনের একটি তালিকা সন্নিবেশের জন্য রওজাতুল আফকার গ্রন্থের সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে। কথিত আছে যে, তৎকালে কবর সমূহের যিয়ারত ছাড়াও বৃক্ষসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং কবরে খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করা হতো। উপরোক্ত দু'টি প্রথা নতুন ব্যাপার নয়। বরং জাহেলী যুগের প্রচলিত রেওয়াজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।(৭)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ব্যাপকভাবে বহু ধর্মীয় গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেছেন বলে যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত হয়, তা তিনি নিজে এবং তাঁর অনুসারীরা একটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ বলে মন্তব্য করেছেন।(৮) অবশ্য তাঁর অনুসারীগণ 'রওদুর রায়াহীন' পুড়িয়ে ফেলার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু 'দালায়েলু খয়রাত' পুড়িয়ে ফেলার কথা স্বীকার করেন না।

আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁরা যে সব বিলুপ্ত করেছেন বলে দাবী করে থাকেন তার একটি তালিকা 'আল হাদিয়াতুস - সুন্নিয়া' তে প্রদত্ত হয়েছে।(৯) কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১। আযানের স্থানে আযান ছাড়া অন্য কোন কথা জোরে উচ্চারণ করা।

২। জুম'আর খুৎবার পূর্বে আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীস আবৃত্তি করা।

৩। মিলাদুন্নবীর আবৃত্তি শ্রবণের জন্য বহু লোকের বিশেষ সমাবেশ।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত পুস্তগুলো প্রসিদ্ধঃ

১। কিতাবুত তাওহীদ;

২। কিতাবু কাশফুশ শুবহাত;

৩। কিতাবু উসূলুল ঈমান;

৪। কিতাবু ফাজায়েলুল ইসলাম;

Dhaka University Institutional Repository

৫। কিতাবু ফাজায়েলুল কুরআন

৬। কিতাবু সীরাতুল মুখতাসারাহ;

৭। কিতাবু সীরাতুল মুতাওয়ালা;

৮। কিতাবু মাজমুউল হাদীস;

৯। কিতাবু মুখতাসারুল আনসাফ ওয়াশ শরহেল কবীর মিনহাজ;

১০। কিতাবু মুখতাসারুল মিনহাজ;

১১। কিতাবু মুখতাসারুল ঈমান;

১২। কিতাবু আদাবুল মাশী ইলাস সালাত;

১৩। মুখতারসার ফতোয়া ইবনে তায়মিয়া।

এ গ্রন্থসমূহে তাঁর মতবাদ স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় তিনি ওলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ খন্ডন করে পত্রাদি প্রেরণ করেন। তাঁর লিখিত দু'খানি চিঠির নিম্নোক্ত অংশ বিশেষ তাঁর মতবাদ সম্পর্কে ধারণাকে সুস্পষ্ট করবে।

কাসীমের আলেমদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তাঁর চিঠিতে তিনি বলেনঃ(১১)

আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে,

১। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়া, যে সকল অভিমত পোষণ করে থাকেন, আমার অভিমতও তাহাই।(১২)

২। আমি আল্লাহ, তাঁর রসুল, ফিরিশতা, আল্লাহর কিতাব, পুনরুত্থান এবং তাকদীরের উপর ঈমান রাখি।

৩। কুর'আন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর গুণাবলীর অপব্যাখ্যা না করে তা যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই স্বীকার করে থাকি। আল্লাহর নির্গুণ হওয়া স্বীকার করি না। বরং তাঁর গুণাবলীকে অনুপম এবং সৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনাবিহীন বলে জানি।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কুর'আন আল্লাহর বাণী এবং কাদীম (অনাদি)। আল্লাহর কুর'আনকে তাঁর রসুল মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযিল করেছেন।

৫। আল্লাহর ইচ্ছা এবং নির্ধারণের বাহির্ভূত কিছুই ঘটতে পারে না বলে বিশ্বাস করি। সমস্ত কার্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর তাকদীরের সীমা লঙ্ঘন কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৬। রাসুলে কারীম (সঃ) এর শাফায়া'তের উপর ঈমান রাখি।

৭। আমি বিশ্বাস করি যে, মুমিনগণ তাঁর প্রভুর দর্শন লাভে ধন্য হবেন।

৮। আল্লাহর ওয়ালীগণের কারামত (অলৌকিক কার্যাবলী) ও কাশফের (অন্তদৃষ্টি) কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁদের কাউকেও প্রভুত্বের অধিকারী ও ইবাদাত যোগ্য বলে মানিনা।

৯। দাজ্জালের পতন পর্যন্ত তরবারীর জেহাদ ব্যবস্থা বলবৎ ও ফরজ।

১০। শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে বিশ্বাস করি।

১১। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাললাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ নবীরূপে বিশ্বাস করি। যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করেনা তাকে মুমিন বলে স্বীকার করি না।

১২। কোন মুসলিমকে কাফির বলি না এবং তাদের কাহাকেও ইসলামের বহির্ভূত বলে বিশ্বাস করিনা।

১৩। নেক্কার ও ফাসেক নেতার পতাকার নীচে জেহাদ এবং তাদের পিছনে নামায আদায় করা জায়েজ মনে করি।

১৪। আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্য এবং ব্যবহারিক আচরণ এই তিনটিকে আমি ঈমানের অংশ বলে মনে করি। সৎ আমলের দ্বারা ঈমান বর্ধিত এবং পাপকার্যের ফলে তার ক্ষতি সাধিত হয় - এ বিশ্বাস করি।

পত্রের শেষাংশে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব চার মযহাবের গ্রন্থসমূহকে বাতিল জানার, পূববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণকে অগ্রাহ্য করা, রাসুলে পাক

Dhaka University Institutional Repository

(সঃ) এর পবিত্র মাজার ও পিতৃপিতামহগণের কবর যিয়ারতকে হারাম জানার অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ ছাড়াও দালাইলুল খয়রাত নামক কিতাবকে 'রওদাতুশ শায়াতীণ' আখ্যায়িত করার অভিযোগকে দৃঢ় কণ্ঠে অস্বীকার ও উহা ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেন।(১৩)

সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ আলেম আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাগদাদীর (১১৩৪-১২০০ হিজরী) নিকট এক পত্রে তিনি লিখেনঃ আমি জনসাধারণকে তওহীদের শিক্ষা প্রদান করেছি। বিপদের সময় মৃত সাধু-পুরুষ ও ওয়ালীদের প্রতি আহ্বান ও তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিষেধ করেছি। তাঁদের কবরে নযর নিয়ায ও মানত দিতেও কবরকে সেজদা করতে নিষেধ করেছি।

আমি আমার অনুসারীগণকে পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায়, যাকাত দিতে ও সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান হতে বিরত থাকায়, মাদক দ্রব্যাদি পরিহার এবং মুনাফিকীকে ঘৃণা করতে আদেশ দিয়েছি। দেশের নেতৃস্থানীয় ও বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে আমার প্রচারিত তাওহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে।

যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইসলাম ধর্ম পরিহার কিংবা রাসুলে পাক (সঃ) কে কটুক্তি করে এবং তাঁর অনুসরণে বাধা দেয় আমি কেবল তাকেই কাফের বলে মনে করি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে উম্মাতের অধিকাংশ লোক এরূপ নহেন।(১৪)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. Muhammad Almana, Arabia Unified, London, Hurchinson, Benham, 1980, P. 121

২. আহমদ আব্দুল গফফুর আত্তার, হুকরুল জাযীরাহ, দ্বিতীয় খন্ড, মক্কা, ১৯৬৬, পৃঃ ১৯৮ ।

৩. ডঃ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আবুদ, আকীদাতুশ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, মদীনা, ১৪০৮ হিজরী, পৃঃ ১৬ ।

الدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود - المملكة العربية السعودية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٨ه، ص/٥٦-١٥٣

৪. ঐ, পৃঃ ৪৪৭ ।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সালেহ আর বাস্সাম, তাইসীরুল আল্লাম, ১ম খন্ড ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মক্কা, ১৯৮৪, পৃঃ ১২৮ ।

عبد الله بن عبد الرحمن ابن صالح آل بسام ، تيسير العلام - مكة المكرمة : ١٤٠٤ه،ص/١٢٨

৬. S. Zwemer, The Mohammadan World of To-day, New York, 1906, P. 106.

৭. শায়েখ উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বিশর, উনওয়ানুন মাজদ ফী তারীখে নজদ, রিয়াদঃ ১৩৮৫ হিজরীঃ পৃঃ ১০৫ ।

الشيخ عثمان بن عبد الله بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد- الرياض- ١٣٨٥ه،ص/١٠٥

৮. শায়েখ হোসাইন ইবনে গনাম রওজাতুল আফকার, ১ম সংস্করণ, রিয়াদ, ১৩৬৮ হিজরী, পৃঃ ১৫৮-৬৭ ।

الشيخ حسين بن غنام - روضة الافكار-مصر - ١٣٦٨ه -ص/١٦٧-١٥٨

Dhaka University Institutional Repository

৯. ঐ, পৃঃ ৪৭-৪৯।

১০. আল মাসুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮-১১৯।

১১. ঐ, পৃঃ ৫৯১।

১২. ঐ, পৃঃ ৫৯০।

১৩. ইবনে গনাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৯।

১৪. ঐ, পৃঃ ৫৪-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইখওয়ানের সামরিক কার্যক্রম

যুদ্ধ তৎপরতা —

ইখওয়ান একটি সামরিক শক্তিরূপে গড়ে ওঠে। সৈনিক হিসেবে ইখওয়ানরা নিজেদেরকে তাওহীদের বীরযোদ্ধা মনে করতো। তারা ধর্মযুদ্ধে শহীদরূপে মৃত্যু বরণের আকাঙ্খা পোষণ করতো। কালেমা খচিত পতাকা হাতে নিয়ে দুইজন অশ্বারোহী দলের অগ্রভাগে থাকতো। ইখওয়ানরা সাধারণত তাদের লক্ষ্যস্থান সমূহে প্রত্যুষে আঘাত হানতো। আরবরা এই অভিযান খুবই ভয় করতো। এদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাওহীদে যাঁরা বিশ্বাসী ছিল না তাদেরকে তারা কাফের মনে করতো (১)

২৪শে জানুয়ারী ১৯১৫ সালেই 'ইখওয়ান' বাহিনী জেরাব যুদ্ধে সামরিক শক্তি হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে (২) এই যুদ্ধ ছিল রশীদ বংশের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতক আজমান গোত্র রশীদীর পক্ষ অবলম্বন করে। ইখওয়ানরা এই কারণে পরাজিত হন।(৩)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইবনে সউদ আরবের পূর্বাঞ্চল হতে ওসমানীয়া তুর্কীদেরকে তাড়িয়ে সীমানা আরব সাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইবনে সউদ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং সব রকম যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ রাখেন।(৪)

জেরাব যুদ্ধ | ২৪শে জানুয়ারী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ / ৭ই রবিউল উলা ১৩৩৩ হিজরী |

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ইবনে সউদ নিরপক্ষে ভূমিকা পালন করেন।(৫) ইতিমধ্যে ইবনে রশীদ তুরস্কের সাথে দ্বিতীয়বার চুক্তিবদ্ধ হন। তুরস্ক ইবনে রশীদকে পর্যাপ্ত সাহায্য দেন। বৃটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে ইবনে সউদের হস্ত শক্তিশালী করেন। জাবালে শাম্মারবাসী ইবনে সউদের সমর্থক ছিলেন। উক্ত অঞ্চলের শাসক ছিলেন মোতাব ইবনে আব্দুল আজিজ আলে রশীদ।(৬) ১৯১৪ সালে কুয়েতে বৃটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ডব্ল্যূ.এইচ.আই. শেক্সপিয়ার নজদে গিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইবনে সউদের সহযোগিতা কামনা করেন। ইবনে সউদ তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন।(৭) ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে রশীদ বংশের বিরুদ্ধে অভিযানে ইখওয়ান বাহিনী প্রেরণ করেন। কাসীম প্রদেশের জিলফীর নিকটবর্তী জিরাব নামক জায়গায় উভয় পক্ষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন।(৮) যুদ্ধে কোনপক্ষই জয়ী হতে পারেননি। শেক্সপিয়ার ইবনে সউদের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। উক্ত যুদ্ধে ইবনে রশীদের সেনাবাহিনীর গুলিতে ১৯১৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী শেক্সপিয়ার নিহত হন।(৯)

তারাবার যুদ্ধ | ২৬শে মে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ / ২৫ শাবান ১৩৩৭ হিজরী |

১৯১৩ সালে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে বৃটেনের এক খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তদানুসারে ইবনে সউদের অধীনস্থ এলাকা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ বলে বৃটেন স্বীকার করে। ওসমানীয় সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির দিকে যোগ দিলে এ মনোভাবের পরিবর্তন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৬ সালের জুন মাসে মক্কার শরীফ হোসাইন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মিত্রপক্ষে যোগদান করেন। বৃটেন আরবের শাসকবর্গের সাথে চুক্তির মাধ্যমে তাঁর প্রভাবান্বিত এলাকা হিসেবে বজায় রাখার প্রয়াস পান। এ নীতি অনুসারেই এক চুক্তিতে বৃটেন ইবনে সউদকে নজদের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ইবনে সউদও অন্য কোন শক্তির সাথে যোগাযোগ বা চুক্তি সম্পাদন করবেন না বলে বৃটেনের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।(১০) বৃটেন মক্কার শরীফ হোসাইনের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হন যে, তাঁকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন এবং আরবদেশ সমূহের বাদশাহর স্বীকৃতি দেবেন। আবহার শাসক ইদ্রিসের সাথে ও অনুরূপ চুক্তিবদ্ধ হন। ইদ্রিস তুরস্কের বিরুদ্ধে থাকবে যার বিনিময়ে আসীর প্রদেশ ইদ্রিসের রাজ্যভুক্ত ও তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করবে।(১১)

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধশেষে ইখওয়ান বাহিনী নিজেদের প্রচেষ্টায় বৃহৎ বিজয় অর্জন করেন। যার ফলে হেজাজ থেকে মক্কার শরীফ হোসাইনের হাশেমী বংশের অবসান ঘটে।(১২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তি আরব দেশ সমূহের জাতীয়বাদী আন্দোলন উপেক্ষা করে। মিত্রশক্তি ম্যান্ডেটরী (Mandatory) ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় আরব রাষ্ট্র সমূহ ইউরোপীয় শক্তির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

আরব জাতির এই দুর্দিনে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ মুসলিম তীর্থস্থান সমূহ থেকে বিজাতীয় প্রভাব মুক্ত করতে তৎপর হন। মক্কার শরীফ হোসাইনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আরবে তাঁর সুনাম ছিলনা। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ শরীফ হোসাইনের এই দুরবস্থার সুযোগ নেন।

ইবনে সউদ এবং মক্কার শরীফ হোসাইনের মধ্যে বৈরিতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হেজাজ ও নজদের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ খুরমা ও তারাবা মরুদ্যান দু'টির উভয়েই দাবী করে আসছিল। মরুদ্যান দু'টির অধিবাসীদের উভয়েই আনুগত্যের দাবী করেন।(১৩)

খুরমা মরুদ্যানটি মক্কার পূর্বদিকে ১১০ মাইল দূরে অবস্থিত। মক্কার শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

হোসাইন খুরমা মরুদ্যানটি তাঁর রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করেন।(১৪) কিন্তু খুরমার অধিবাসী ভিন্নমত পোষণ করতো। এরা ইবনে সউদের অনুগত প্রজা বলে ঘোষণা করেন।

১৯১৪ সালে শরীফ হোসাইন খালিদ ইবনে মনসুর ইবনে লুয়াইকে খুরমার আমীর নিয়োগ করেন।(১৫) ১৯১২ সালে তুর্কী বাহিনী যখন মদীনা অবরোধ করে তখন ইবনে লুয়াই তাঁর আত্মীয় শরীফ হোসাইনের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লার সঙ্গে খুরমা অঞ্চলে ফিরে আসেন। ১৯১৮ সালে খুরমায় ইবনে লুয়াই ইবনে সউদের একজন ইখওয়ান সদস্য হিসেবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করান।(১৬) ইবনে লুয়াই ইখওয়ানের ওয়াহাবী ধর্মীয় চিন্তাধারা খুরমার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করেনা।

শরীফ হোসাইন ১৯১৭ সালে ওয়াহাবী মতবাদ ত্যাগ করবার জন্য খুরমার অধিবাসীদের নিকট ধর্ম প্রচারক পাঠান। কিন্তু লুয়াই তাদেরকে তাড়িয়ে দেন।(১৭)

১৩৩৬ হিজরী/১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে শরীফ হোসাইন খুরমার ইবনে লুয়াইর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সব অভিযানই ব্যর্থ হয়।(১৮) তিনটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর শরীফ হোসাইন একটি বৃহত্তর অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযানে নেতৃত্বের ভার দেন দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহর উপর।(১৯)

খুরমা ও তারাবা মরুদ্যান দু'টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গোত্র ছিল উতায়বা। ইবনে সউদ ইতিমধ্যেই গাতগাত অঞ্চলে ইবনে হুমায়েদের, নেতৃত্বে উতায়বা গোত্রের একটি শক্তিশালী অংশকে তাঁর সমর্থক হিসেবে পান। নজদের ইখওয়ানের উদ্দেশ্য ছিল খুরমায় তাদের দলের যে সমস্ত লোক রয়েছে শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্তে তাদের কাছে সাহায্য পাঠানো এবং অবশেষে তাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

আব্দুল আজিজ মক্কার শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে সুলতান ইবনে বিজাদ ও গাতগাত অঞ্চলের উতায়বার ইখওয়ানদেরকে লেলিয়ে দেন। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ ইখওয়ান সদস্য খুরমা অঞ্চল থেকে এসেছিল। তারা খুরমা দখল করেই ক্ষান্ত হয়না। মক্কা মদীনা এবং সমস্ত লোহিতসাগর অঞ্চল করায়ত্ব করার সুবর্ণ সুযোগ নেন।(২০) আব্দুল আজিজ জানায় যে, খুরমা অঞ্চলে নজদ এবং হেজাজের সীমানা নির্ধারণে বৃটিশদের সালিসীর রায় তিনি মেনে নিবেন। কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানতেন এই সালিসীর দ্বারা মীমাংসা হবে না। এই যুদ্ধের ফলাফল ইখওয়ানের অনুকূলে। আব্দুল আজিজ যদি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারেন তা হলে অদূর ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে যে কেউ নেতৃত্ব দিবেন। যেমন গোত্রীয় নেতা ফয়সল আদ-দুবেশও নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন।

মক্কার শরীফ হোসাইনের দ্বারা আরব রার্জে বৃটেনের আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়। স্যার পারসী কক্স নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। ফিলবী সম্পূর্ণ অবাস্তব নীতি গ্রহণ করেন।

লর্ড কার্জন মক্কার শরীফ হোসাইনকে সমর্থন করেন। ইবনে সঊদ ও শরীফ হোসাইন উভয় খুরমা মরুদ্যান জয়ের আশা পোষণ করেন।

লর্ড কার্জনের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। ইখওয়ানরা সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে যুদ্ধরত ছিল। যা বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর শরীফ হোসাইনের পুত্র আব্দুল্লাহ জানতেন। আব্দুল্লাহ তায়েফের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। তারাবা এবং খুরমা অভিযানের সময় তুর্কীরা শরীফ হোসাইনের জাছে মদীনা হস্তান্তর করেন।

১৯১৮ সালের ৩রা জুন আব্দুল্লাহ এক আকস্মিক অভিযানে খুরমা দখল করেন। তিনদিন পরেই খালিদ ইবনে লুয়াই-এর নেতৃত্বে একটি ইখওয়ান বাহিনী খুরমা আক্রমণ করেন। তারা আব্দুল্লাহয় বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। আব্দুল্লাহও তার কয়েকজন সঙ্গী সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি ফেলে প্রাণ নিয়ে মক্কায় পালিয়ে যান।(২১)

খুরমা অঞ্চলের জনগণ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ইবনে সঊদের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দেন। অপরদিকে ইবনে সঊদ এর নির্দেশে সুলতান ইবনে বিজাদ গাতগাত অঞ্চল থেকে ১১০০ ইখওয়ান বাহিনীর একটি দল খুরমা মরুদ্যান রক্ষার্থে মোতায়েন করেন। আব্দুল আজিজ

Dhaka University Institutional Repository

বৃটেনকে লিখেন যে, তিনি মরুদ্যান সমস্যার সমাধানে সালিসী মানতে প্রস্তুত। শরীফ হোসাইন যদি পুনর্দখল করার জন্য অভিযান চালান সে জন্য তিনি দায়ী হবেন না। তিনি এ শতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। হোসাইনকে টি.ই. লরেন্স এবং ইবনে সঊদকে ফিলবী সমর্থ জ্ঞাপন করেন।(২২)

ইত্যবসরে শরীফ হোসাইনের পুত্র আব্দুল্লাহ তারাবা দখল করেন। তিনি ৫০০০ সৈন্য, ১০টি ফিল্ডগান, ২০টি মেশিনগান সহ তারাবায় অবস্থান নেন। আবদুল্লাহর দৃঢ় আস্থা ছিল যে, খুরমা থেকে রিয়াদ এবং সমস্ত নজদ ও উপসাগরের পূর্বাঞ্চল তিনি দখল করতে পারবেন। আব্দুল্লাহ তাঁর পিতাকে এ শুভ সংবাদ জানিয়ে দেন। অনুরূপভাবে আব্দুল আজিজের প্রেরিত দূতের কাছে দম্ভপূর্ণ উক্তি করেন।

তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, হজ্ব মওসুম সমাগত। হজ্ব অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারাবায় সৈন্য মোতায়েন থাকবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন তারা তারাবা মরুদ্যান ছাড়বেন না। এমন কি খুরমা মরুদ্যানও তাদের রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২৫ মে ১৯১৯ সালে আব্দুল্লাহর এই দম্ভপূর্ণ উক্তি শোনা মাত্রই ইখওয়ানরা সুলতান ইবনে বিজাদ ও ইবনে লুয়াইর যৌথ নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্য মাগরিবের নামাজের পূর্বেই তারাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তারা আরবের প্রচলিত যুদ্ধ মহড়াও দিতে থাকেন। তারা গাতগাত অঞ্চলের তিন মাইল এলাকা ঘিরে ফেলেন। ইখওয়ানের বিশ্বাস ছিল যে, তারা আল্লাহর সৈনিক, তাঁরা মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

সূর্যোদয়ের পূর্বে ইখওয়ানরা তারাবায় পৌছেন। তারা সেখানে মহড়া দেয় এবং শ্বেত ত্রাস সৃষ্টি করে।(২৩) আব্দুল্লাহর সৈন্যরা ক্যাম্পে যখন নিদ্রিত ছিল তখন ইখওয়ান বাহিনী তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করে। আব্দুল্লাহর বাহিনী পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। ফলে মক্কার পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত হলো।

সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদাদি পরিত্যাগ করে আব্দুল্লাহ তাঁর ৬০/৭০ জন সঙ্গী

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে কোনক্রমে পলায়ন করেন।(২৪) ৪০০০ নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে ১০০ সেনা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।(২৫)

১৯১৯ সালের ২৬শে মে সূর্যোদয়ের পূর্বে তারাবার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। আব্দুল্লাহর তায়েফে পৌঁছার সাথে সাথে খবর পান যে তাঁর সৈন্য বিধ্বস্ত হয়েছে।(২৬)

শরীফ হোসাইন এই পরাজয়ের খবর পেয়ে ক্রুদ্ধভরে আরবের প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করেনঃ(২৭)

ইখওয়ানরা মক্কা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হলো। আব্দুল আজিজ ভাবলেন, এ মুহূর্তে মক্কা আক্রমণ করলে বৃটেন শরীফ হোসাইনের পক্ষ নিবে। আব্দুল আজিজ কুটনৈতিক কারণে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠান এবং পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, মক্কায় অভিযানের পূর্বে হাইলের রশীদ পরিবার উৎখাতে সচেষ্ট হতে হবে।(২৮)

তারাবার যুদ্ধ (১৩ অক্টোবর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ / ২৬ মহররম ১৩৩৯ হিজরী)

১৯১৪ সালে ইবনে সউদ কুয়েতের শাসক শেখ মোবারকের পুত্র শেখ সালেম আস-সাবাহ সম্পর্কে এক পত্রে অভিযোগ করেন- সালেম উজমান গোত্রের সহযোগিতায় তাঁর রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত। তিনি বলেন আমি চাইনা আপনি উজমানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শেখ মোবারক ইবনে সউদ ও উজমানের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপনে লিপ্ত ছিলেন। ইবনে সউদ উজমান এবং মোবারকের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু রমজান ১৩৩৪ হিজরী/১৯১৫ সালে শেখ মোবারকের ইন্তেকালের কারণে ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। মোবারকের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাবের ক্ষমতাসীন হন। ঐ বছর শেখ জাবের বৃটেন এবং ইবনে সউদের সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যা কাতিফের চুক্তি নামে খ্যাত। বৃটিশ প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় শেখ জাবের ও ইবনে সউদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উজমান গোত্রকে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করেন। শেখ জাবেরের মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত সন্ধি স্থায়ী ছিল।(২৯)

Dhaka University Institutional Repository

শেখ জাবের আস-সাবাহ এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই শেখ সালেম আস-সাবাহ কুয়েতের আমীর নির্বাচিত হন। জাবের ইবনে সাবাহর সঙ্গে তাঁর শত্রুতার কারণে কাতিফের চুক্তি ভঙ্গ করেন।

শেখ সালেম ১৯১৭ সালে জাবালে মানিফার উত্তারে তাঁর রাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমানায় একটি নতুন দূর্গ তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন।(৩০) কাতিফ এলাকার 'বুল বুল' নামক স্থান নির্বাচন ও সেখানে একটি শাহী ভবন নির্মাণ শুরু করেন। কাতিফ ইবনে সউদের রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি মুতায়ের শেখ ইবনে সুকায়েরের মারফত বৃটেনের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠান। শেখ সালেম উপরোক্ত কার্য বন্ধ না রাখলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বৃটেন শেখ সালেমকে 'বুল বুল' দুর্গ নির্মাণে বাধা দেন। শেখ সালেম বৃটেনের বাধার মুখে তাঁর পরিকল্পনা বাতিল করেন।(৩১)

শেখ সালেম কারিয়া লাহজাহর (قرية اللهجة) মোতায়র গোত্রের ইখওয়ানদের তাড়িয়ে দেন।(৩২) শেখ সালেম দাবী করেন উক্ত অঞ্চল তাঁর পূর্ব পুরুষ হতে কুয়েতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইখওয়ান বাহিনী তখন যুদ্ধের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। মোতায়র গোত্র প্রধান ও ইখওয়ান নেতা ফয়সল আদ-দুবেশের নেতৃত্বে জমায়েত হন। যুদ্ধে শেখ সালেমের বাহিনী ইখওয়ান বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ইখওয়ান বাহিনী কুয়েত বাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদ হস্তগত করেন।

শেখ সালেম ক্বারিয়া লাহজায় পরাজিত হয়ে ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনীর সঙ্গে আর একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।(৩৩)

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইখওয়ান নেতা ফয়সল আদ-দুবেশ কুয়েতের সংলগ্ন বাইরে একটি ছোট গ্রাম আল-জাহরা নামক মরুদ্যান আক্রমণ করেন।(৩৪) কুয়েতের শাসক শেখ সালিম সংবাদ পেলেন যে, ফয়সল আদ-দুবেশ সুবাইয়ার উত্তর দিক থেকে বারকান পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিয়ে জাহরা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। জাহরা মরুদ্যানটি কুয়েতের

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুয়েতের শেখ সালিম তাঁর যুদ্ধ পতাকা এবং উপস্থিত সেনাবাহিনী নিয়ে আল-জাহরা রক্ষার্থে রওয়ানা হন।

ফয়সল-আদ-দুবেশ ইখওয়ান বাহিনী নিয়ে ৯ই অক্টোবর সুবাইয়া উপস্থিত হন। শেখ সালিম কুয়েতের নতুন সীমানা প্রাচীর স্থাপনের জন্য শহরের সক্ষম পুরুষদেরকে সামরিক কাজে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ১৩৩৯ হিজরী ২৬শে মহররম ভোর ৬ টায় আদ-দুবেশ জাহরা আক্রমণ করেন।(৩৫) শেখ সালিমের সৈন্যরা জাহরার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান নেন। ইবনে তুয়াইলার দল শাম্মার পাহাড়ের দক্ষিণে এবং দাইজ আল-ফাদেলের দল উত্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন। শেখ সালিম অন্যান্য শেখসহ জাহরার দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে আরও ৬০০ সৈন্যসহ অবস্থান নেন। তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য সব দিকে ছড়িয়ে দেন। সকাল ৯টার মধ্যে সমস্ত জাহরা আদ-দুবেশ দখল করেন।

অপরাহ্নে ফয়সল আদ-দুবেশ কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে শেখ সালিমের নিকট দূত প্রেরণ করেন। শেখ সালিম শর্তারোপিত শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আদ-দুবেশ শীঘ্রই কুয়েত শহর দখল করবেন। পরের দিন ভোরে শেখ আহমদ আল-জাবের আস-সাবাহ যিনি কুয়েতের সেনা প্রধান ছিলেন, তিনি তার সংগঠিত সেনাবাহিনী জাহরায় পাঠান। প্রায় ৬০০ সৈন্য নৌপথে এবং অবশিষ্টাংশ ইবনে তুয়ায়লার নেতৃত্বে স্থল পথে পাঠালেন।

উক্ত সেনাবাহিনী জাহরা পৌঁছার পূর্বে ফয়সল আদ-দুবেশ ইবনে সুলায়মান নামে একজন আলেমকে সুনির্দিষ্ট শান্তি প্রস্তাব দিয়ে শেখ সালিমের নিকট পাঠান। আদ-দুবেশ দাবী করলেন যে, শেখ সালিমকে কুয়েতে সর্বপ্রকার ধুমপান, মদ্যপান, জুয়া খেলা ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে। শেখ সালিম হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন।(৩৬) তবে বিদেশীদের ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে তিনি অক্ষমতা জানান।(৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সুলায়মান ফিরে এসে আদ-দুবেশের সাথে আলোচনার পর জাহরার সমস্ত উট ও রসদাদি সহ ইখওয়ান সৈন্য প্রত্যাহার করেন। এই রূপে শেখ সালিম অত্যন্ত সাহসীকতা ও ধৈর্য্যের সাথে জাহরা মরুদ্যান পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। আল-জাহরা যুদ্ধে উভয় পক্ষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রচুর। কুয়েতের এমন কোন গোত্র ছিল না যে, এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।(৩৮)

কুয়েতে বৃটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধি মেজর জেঃ সি. মোর বলেন, জাহরার বাইরে ৮০০ মৃত্যুবরণ করে ও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়। তিনি সুবাইয়া পৌছার পূর্বে ৪০০ সৈন্য মারা যায় এবং পৌছার পর শতাধিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। জাহরার ঘটনা ছিল শেখ সালিমের কুটনৈতিক বিজয়।(৩৯)

আদ-দুবেশ কর্তৃক আল-জাহরা অভিযান ইবনে সউদের আদেশে হয়নি। বরং আদ-দুবেশ নিজের উদ্যোগে অভিযান চালান। যুদ্ধ শেষে কুয়েতের শেখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ইবনে সউদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে সউদকে তাঁরা বলেন যে, তাদের বিশ্বাস এই অভিযানে তাঁর কোন হাত ছিল না। প্রাথমিক আলোচনা শেষে দল নেতা শেখ সালিম আস-সাবাহ আব্দুল আজিজ ইবনে সউদকে বলেন যে, সউদী আরবের সীমানা কুয়েত শহরের সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হোক। ইবনে সউদ প্রত্যুত্তরে বলেন কুয়েতের সীমানাও রিয়াদের সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।(৪০)

কুয়েতের শেখ সালেম, আদ-দুবেশ ও ইবনে সউদের সাথে বন্ধুত্বের নামে প্রতারণার আশ্রয় নেন। অপর দিকে শেখ সালেম বৃটেনের সাহায্য কামনা করেন।(৪১) ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে শেখ সালেম বৃটিশ হাই কমিশনারকে জানান যে, রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ইখওয়ানের অগ্রযাত্রা রোধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।(৪২)

বৃটেন কুয়েতকে সাহায্য করার জন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কুয়েত বন্দরে দু'টি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং ইরাক থেকে দু'টি সামরিক বিমান পাঠিয়ে ইখওয়ানকে সতর্ক করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

আদ-দুবেশ কোনরূপ বিনা বাধায় ইরাকের আয-যুবায়র এলাকার শহরতলী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এরপর বৃটিশ সেনারা তাঁর অগ্রযাত্রা রোধ করে।

১৯২০ সালের ৩০শে অক্টোবর শেখ সালিম কুয়েতে অবস্থানরত বৃটিশ হাই কমিশনার, স্যার পারসী ককসকে জানান যে, আর রক্তপাত নয়। ইবনে সউদের সাথে আপোষ মীমাংসা করতে হবে। পারসী ককস বলেন 'সুবাইয়া' ইবনে সউদ বা শেখ সালিম কারুর অধিকারে থাকবে না। এই প্রস্তাব বাহরাইনের বৃটিশ প্রতিনিধির মাধ্যমে ইবনে সউদের নিকট পাঠান।(৪৩)

বসরার পূর্ব দক্ষিণ দিকে ৩০ মাইল দূরে ইরানী শহর মুহামমেরাহ। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে খাজায়াল খান যিনি মুহামমেরাহর শেখ তাঁর পুত্র সাচিবকে (CHASIB) শেখ সালিমের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শেখ আহমদ মারফত নজদে একটি মিশন পাঠান। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল সালিম এবং ইবনে সউদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। মিশনটি ফেব্রুয়ারী মাসে নজদের উদ্দেশ্যে বাহরাইন ত্যাগ করে। ইবনে সউদ তখন রিয়াদের দক্ষিণ দিকে আল-খাফস ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। ১৯২১ সালের ২রা মার্চ মিশনটি খাফসে পৌঁছেন। ৪ঠা মার্চ তাঁরা খবর পেলেন শেখ সালিম ২৩শে ফেব্রুয়ারী অসুস্থ হয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্র ইবনে সউদ বললেন আর ঝগড়া নয়, তাঁর এবং কুয়েতের মধ্যে সীমানা প্রাচীরেরও প্রয়োজন নেই।(৪৪)

শেখ সালিমের চেয়ে শেখ আহমদ আল জাবের আস-সাবাহ ইবনে সউদের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আহমদ ও ইবনে সউদের মধ্যে এপ্রিল ১৯২১ সালে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।(৪৫)

কুয়েতের সঙ্গে ইবনে সউদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কুয়েতের পরবর্তী শাসক, এক প্রতিনিধি পাঠান এবং একটি সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন।(৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

হাইল বিজয় { ২ নভেম্বর, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ
২৯ সফর ১৩৩৯ হিজরী }

১৯২১ সালের গোড়ার দিকে ইখওয়ানরা ক্রমাগতভাবে রশীদ পরিবারের বিরুদ্ধে ইবনে সউদকে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী জানান। ইবনে সউদ হাইলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি আক্রমণকারী দল পাঠান। তারা সামান্য বাধার সম্মুখীন হন।(৪৭) ইখওয়ানরা হাইলে লুটতরাজ করে নিরাপদে তাঁদের সামরিক ছাউনীতে ফিরে আসে।(৪৮) মক্কার শরীফ হোসাইন এবং ইরাকের ফয়সল বৃটেনের কাছে অনুরোধ জানায় ইবনে সউদ যেন পূর্ব সীমানায় ফিরে যান। প্রত্যুত্তরে বৃটেন বলে তাদের কিছুই করার নেই। কারণ এ ছিল দুই শাসকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।(৪৯)

আবহা এবং আসীর বিজয়ের পর ইখওয়ান মক্কার শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তাঁর রাজ্য জয়ের জন্য আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এ ব্যাপারে ইখওয়ানের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯২১ সনের ১লা অক্টোবর ইবনে সউদ ইখওয়ানের অন্যতম 'হুজরা' সাকরায় একটি সম্মেলন ডাকলেন। ইখওয়ান সেনাপ্রধানরা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। তাদের ধারণা ছিল বৈরী শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিবেন।(৫০)

পরবর্তী দিন সাকরাবাসী, তার সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও গ্রাম প্রধানগণ সাকরা শহরের দক্ষিণ দিকে সমবেত হন। আব্দুল আজিজ দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন। এখানে যে সামরিক কুচকাওয়াজ হয় মধ্য আরবে স্মরণীয়কালে তা সর্ববৃহৎ বলে পরিগণিত হয়।(৫১)

সামরিক কুচকাওয়াজ শেষে বিশাল জনসভায় ইবনে সউদ ঘোষণা করলেন যে, 'আপনাদেরক আমার প্রয়োজন'। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, আবার আমাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। কোথায় কার সাথে যুদ্ধ করতে হবে তা নির্দিষ্ট না করে তিনি আবার ঘোষণা করলেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের জাতশত্রু মোহাম্মদ ইবনে রশীদকে পরাজিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে।

সেনাপ্রধানরা দাঁড়িয়ে বললেন, 'মোহাম্মদ ইবনে রশীদের দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? ইবনে রশীদ আমাদের নিকট গুরুত্বহীন। বরং মক্কার শরীফ হোসাইন আমাদের জাতশত্রু। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে'।(৫২)

ইবনে সউদ এর কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। ইখওয়ানের সেনাপ্রধান শেখ ফয়সল আদ-দুবেশ সৈনিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি খুরমায় আমাদের ইখওয়ানের উপর বৃটিশ অস্ত্রের সাহায্যে অত্যাচার করেছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, যারা আমাদের বিশ্বাস ও নীতিমালার বিরোধিতা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করবো। তিনি ইবনে সউদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি কি এজন্য আমাদেরকে ইখওয়ানে ভর্তি এবং যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? হে ইবনে সউদ আমরা আপনার নির্দেশে শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরতে প্রস্তুত একটি শর্তে তা হলো শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। শরীফ হোসাইন আমাদের পবিত্র শহরগুলিকে বিধর্মীদের দ্বারা অপবিত্র করেছেন। আপনি জানেন আমরা বিদেশীদের নির্দেশ মানবনা। আমার এই বক্তব্য প্রতিটি ইখওয়ান সৈন্যদেরই অনভূতি।

ইবনে সউদ আদ-দুবেশের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শুনছিলেন। আদ-দুবেশ বললেন ইবনে রশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হলো বৃটেনকে সুযোগ করে দেয়া। দুবেশ খ্রীষ্টানদেরকে বিশেষভাবে বৃটেনকে ঘৃণা করতেন।

কিছু সময় চুপ থাকার পর ইবনে সউদ বললেন আপনারা আমার কথা শুনুন, আল্লাহ এবং আপনারা ছাড়া আমার কোন সেনাবাহিনী বা শক্তি নেই আমাদের ঐক্যই শক্তি। বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের কিছুই থাকবে না।(৫৩) তিনি আরও বললেন, বৃটেন ইবনে রশীদকে আক্রমণ করতে আমাকে উৎসাহিত করেছে। এতে বৃটেনের স্বার্থ উদ্ধার হবে। তারা আমাকে সামরিক রসদ, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলে আমরা ভাল অবস্থানে থেকে শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

লড়বো। যদি আমরা হাইল জয় করতে পারি তবে মরু গোত্র সমূহ বৃটেনের পরিবর্তে আমার পতাকাতলে আসবে। সুবিধাবাদী গোত্র নেতারা আমার বশ্যতা স্বীকার করবে। তারা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো।

ইবনে সউদ দু'ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে বোঝালেন, তাঁর বক্তৃতা সমাপ্তির সাথে সাথে গোত্র প্রধান এবং ইখওয়ান কর্মকর্তাগণ তাঁদের মত পরিবর্তন করেন। তাঁদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ইবনে সউদের নিকট ক্ষমা চাইলেন। তারা বললেন, হে ইবনে সউদ আমরা আপনার ব্যবহারে সন্দেহ পরায়ন হয়ে ভুল ধারণা করেছিলাম। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাদের চেয়ে আপনি বিজ্ঞ। আপনার সিদ্ধান্তের উপর আমাদের আপত্তি করা ঠিক হয়নি। কিভাবে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন তা আপনি ভাল জানেন। হে ইবনে সউদ আমরা এখনই ইবনে রশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আপনার সাথে প্রস্তুত। তবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আজ রশীদের বিরুদ্ধে এবং আগামীকল্য শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

ইবনে সউদ তাঁদের সাথে একমত হন এবং এক সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। তারপর ইখওয়ান ও ইবনে সউদ সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন। সুরা ফাতেহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইবনে সউদ এই বলে ইখওয়ানদেরকে বিদায় দিলেন।

'আমার প্রতি আপনাদের আনুগত্যের সম্পর্কে আমর কোন সন্দেহ নেই। আমার এবং আপনাদের মধ্যে আর যেন কখনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। আপনারা সেননানিবাসে ফিরে গিয়ে ইখওয়ানদেরকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করুন। আমি বোরায়দা জেলায় পুর্ণিমার রাত্রি আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের বিজয়ে সহায় হউন।(৫৪)

ইবনে সউদ গোটা নজদ ভূমি ইবনে রশীদ পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পশ্চাতপদ হতে বাধ্য করেন। তাদের স্বদেশ ভূমি জাবালে শাম্মার ও তার রাজধানী হাইলে চলে যেতে তিনি বাধ্য করেন। তাঁর রিয়াদের উত্তর দিকে অগ্রগতি ছিল মন্থর। কারণ ইবনে রশীদ পরিবারের তখনো যথেষ্ট শক্তি ছিল। আর তাঁদের পশ্চাতে ছিল তুর্কী সমর্থন। বিগত কয়েক দশক ধরে তুর্কীদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ইবনে রশীদ পরিবারের মজবুত ঐক্যজোট ছিল।

আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের শিশুকালেই মধ্য আরবে তাঁর বংশের শেষ ক্ষমতাটুকু তাঁরা হারিয়ে ফেললেন। হাইলের ইবনে রশীদ বংশ ছিল শাহী সউদ খান্দানের তাবেদার। এখন তারা সউদ বংশের স্থলাভিষিক্ত।

গোত্র যুদ্ধের ইতিহাসে ইবনে সউদ সর্বপ্রথম হাইল অধিকারের সিদ্ধান্ত নেন। হাইলের শহর প্রাচীরে তিনটি দরজা ছিল। প্রতিটি দরজায় একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে প্রহরী পাহারারত ছিল।(৫৫) আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ ২০০০ ইখওয়ান সৈন্যসহ জাবালে শাম্মারে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ইখওয়ান নেতা ফয়সল আদ-দুবেশকে পাঠান। ইবনে সউদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এগুলেন। অপর দিকে তাঁর ১৯ বছর বয়স্ক জেষ্ঠপুত্র সউদ এবং নজদের সহস্রাধিক বীর যোদ্ধারা চতুর্দিকে তাঁর ডানে প্রসিদ্ধ ইখওয়ান বাহিনী এবং বামে দোয়াশীর গোত্রের বাহিনী ছিল।(৫৬) এরপর শহরবাসী, গ্রামবাসী ও গোত্র প্রধানরা তাঁদের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হন।(৫৭)

ইবনে সউদ হাইল আক্রমণের জন্য ভাল সময়ই বেছে নেন। শাম্মার গোত্র নেতাহীন শা'লন বংশের সাথে রশীদ বংশের সুসম্পর্ক ছিলনা। মোহাম্মদ ইবনে রশীদ তুরস্কের সাহায্য লাভে অসমর্থ হয়েছিল এবং হাইলের উত্তরাঞ্চল বৃটেন এবং ফ্রান্সের অধিকারে ছিল। মক্কার শরীফ হোসাইন ও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বাদগাদের অধিপতি থেকে ফয়সল সাহায্য করতেও অপারগ ছিলেন। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের বাহিনী হাইল শহর রক্ষার্থে নিয়োজিত ৩টি ফটকের রক্ষক ক্যাপ্টেনদেরকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। তিন সপ্তাহ পর ক্যাপ্টেনদের মধ্যে একজন প্রলুব্ধ হয়ে রাতে দরজা খুলে দেন।(৫৮) ফলে সহজেই হাইল শহরের পতন ঘটে।(৫৯)

১৯২১ সালের ১লা নভেম্বর ইবনে সউদের সম্মিলিত ইখওয়ান বাহিনী শাম্মার গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস এবং ইবনে রশীদের সেনাবাহিনী পলায়ন করে। রশীদী পরিবারের কিছু সংখ্যক অনুসারী বিশেষভাবে শাম্মার গোত্রের লোকজন ইরাকে পালিয়ে গিয়ে সেখানে থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সউদের প্রজাদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। বস্তুত ইরাককে আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ১৩৪০ হিজরী ২৯শে সফর ১৯২১, ২রা নভেম্বর রশীদ বংশের আমীর মুহাম্মদ ইবনে তালাল ইখওয়ান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে দুই পরিবারের মধ্যে ২০ বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটে। জাবালে শাম্মার ও হাইল আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের রাজ্যভুক্ত হয়। ইবনে সউদের হাইল দখলের ফলে ইবনে রশীদ তাঁদের সর্বশেষ মজবুত ঘাঁটিটি হারিয়ে ফেলেন।(৬১)

ইবনে সউদ বংশের অন্তর্গত তাঁর অন্যতম আত্মীয় জিলুভী শাখার ইবনে মুসাদকে হাইলের আমীর নিয়োগ করেন।(৬২) তিনি পরাজিত রশীদ পরিবারের পুরুষদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। তাঁদেরকে রিয়াদে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ইবনে সউদ নিহত মুহাম্মদ ইবনে রশীদের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর সন্তানদেরকে শিশুদেরকে তাঁর সযত্নে লালন পালন করেন। এভাবে তিনি রশীদী পরিবারের সাথে রক্তের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।(৬৩) দ্রুতগতিতে হাইলের বিজয় এবং সউদী রাষ্ট্রের সাথে নতুন একটি প্রদেশের সংযোজন তাঁর প্রজাদের মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য বৃদ্ধি করে।(৬৪)

ইবনে সউদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং ইখওয়ানের রণকৌশল তাঁকে বহু যুদ্ধে জয়ী করে। হাইল বিজয়ের জন্য ইবনে সউদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে রিয়াদের বড় মসজিদে ইখওয়ান সেনাবাহিনী, জনসাধারণ, গোত্র প্রধানগণ, গণপ্রতিনিধি এবং আলেমগণ সমবেত হন। আব্দুল আজিজের পিতা আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় তাঁকে নজদ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সুলতান উপাধিতে ভূষিত করা হয়।(৬৫) এই উপাধি সউদী পরিবারের জন্য নতুন ছিল। কিন্তু তাঁর পিতা আব্দুর রহমান পুরাতন 'ইমাম' খেতাবই সংরক্ষণ করেন।(৬৬) এইভাবে সমগ্র মধ্য আরবে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্য প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশই যখন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের পদতলে পিষ্ট ঠিক সেই সময়ে ইবনে সউদের এই অভূতপূর্ব বিজয় গোটা আরব জাহানে এক প্রবল আশার সঞ্চার করে।

Dhaka University Institutional Repository

আবহা ও আসীর জয় | ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ | শাওয়াল ১৩৪০ হিজরী |

১৩৪০ হিজরী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইখওয়ান সৈন্যগণ আসীরের মালভূমি আবহা অধিকার করেন। আসীর প্রদেশ লোহিত সাগরের তীরে ও হেজাজের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।(৬৭) ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে আসীর হাসান আল-আয়েজ (آل عائض) নামক আমীরের অধীনে ছিল। তিনি রাজধানী শহর থেকে শাসন করতেন। আল আয়েজ ( ) সামরিক শক্তি দ্বারা তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করেন। তিনি আসীরে তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। পূর্বে আসীর আল-ইদ্রিসী পরিবার দ্বারা শাসিত হতো। ইদ্রিসী পরিবার মক্কার শরীফ হোসাইনের সাহায্যে আসীর দখল করে।(৬৮) স্বভাবতই আল আয়েজ উদ্ধত ও শরীফ হোসাইনের অত্যন্ত বিশ্বাস ভাজন ছিলেন। আল-আয়েজ তাঁর প্রতিপক্ষেয় এবং শরীফ হোসাইনের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

এ সূত্র ধরে আল-আয়েজ হাশেমীয়দের সাহায্যে শক্তিশালী হন এবং তাঁর প্রজাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। আসীরের গোত্র সমূহ প্রধানতঃ শাহরী, শাহরান, কাহতান এবং আসীর গ্রুপে বিভক্ত ছিল। এছাড়া সুবাই ও উতায়বার গোত্রের ও কিছু সদস্য ছিলেন। গোত্রসমূহ গোড়াপন্থী ইখওয়ান কর্তৃক আসীর দখলের পর সেখানকার অধিবাসীগণ মক্কার শরীফ হোসাইনর পরিবর্তে রিয়াদের নেতৃত্বকে স্বীকার করেন।

১৯২১ সালে আসীরের গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ রিয়াদে গিয়ে ইবনে সউদের নিকট আল-আয়েজের স্বৈরশাসনের অভিযোগ করেন। ইবনে সউদ তাদের পক্ষ থেকে তিনি সালিশি করতে একমত হন। হাসান আল-আয়েজ সউদী প্রতিনিধি দলের মধ্যস্থতা মেনে নেন নাই। বরং তিনি দাবী করেন যে, তাঁর অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে এটা রাজনৈতিক নগ্ন হস্তক্ষেপ। আল-আয়েজ ভিন্ন মতাবলম্বী গোত্র নেতাদের উপর দমননীতি শুরু করেন। ফলে প্রাণভয়ে আসীর থেকে অনেকে পালিয়ে যান।

আল-আয়েজ ইবনে সউদকে সম্ভাব্য সমূচিত শাস্তি দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। এতে ইবনে সউদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ১৯২১ সালের শেষের দিকে ইবনে সউদ

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ান নেতা আব্দুল আজিজ ইবনে মাসউদ ইবনে জুলুষীর নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যসহ আসীরে একটি শক্তিশালী অভিযান প্রেরণ করেন।(৬৯) তিনি সেখান থেকে এক পত্রের মাধ্যমে আল আয়েজকে ইবনে সউদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে অনুরোধ জানান। আল-আয়েজ সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি প্রত্যুত্তর দেন। পত্রের মাধ্যমে আল-আয়েজ ইবনে সউদের নিকট একটি বুলেটের প্যাকেট পাঠান। এটা যুদ্ধ ঘোষণার সামিল ছিল। ইবনে সউদ তাঁর সৈন্য নিয়ে আসীরের দিকে অগ্রসর হন। ওয়াদী হাজলায় পৌঁছে দেখতে পান আল-আয়েজ বাহিনী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান (   ) আল-আয়েজের (   ) সেনাপতিত্বে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছে। আসীরের যুদ্ধে আল-আয়েজের বাহিনী পরাজিত হয়। তারা আবহার অধিকার ছেড়ে দেন। হাসান আল-আয়েজ ইতিমধ্যেই আবহাকে সুরক্ষিত করেছিলেন। আসীরেয় সেনাবাহিনীর তুলনায় সউদী ইখওয়ান সেনাবাহিনী ছিল মানসিক ও সামরিক দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। ইখওয়ানের আক্রমণে আল-আয়েজ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আসীরের গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ ইবনে সউদের পতাকাতলে সমবেত হন। সামান্য প্রতিরোধের পর আবহা ইখওয়ানের দখলে আসে।

অবশেষে হাসান আল-আয়েজ ইখওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ইবনে মাসউদ আল-আয়েজকে সম্মানের সঙ্গে রিয়াদে প্রেরণ করেন। ইবনে সউদ তাঁকে রাজ অথিতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি ইবনে সউদ আল-আয়েজকে আসীরে তাঁর আমীর নিযুক্তিরও প্রস্তাব দেন। আল-আয়েজ ইবনে সউদের প্রস্তাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু আল-আয়েজ আসীর প্রত্যাবর্তনে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনসহ হামালাহ উপত্যকায় বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আসীর নেপথ্য কাহিনীর এখানেই শেষ হলো না। ইবনে মাসউদ ফাহদ ইবনে আগাইলীকে আবহার শাসক নিয়োগ করেন। আল-আগায়ইলী জনপ্রিয় শাসক হতে পারেননি। ফলে বেদুঈনরা আবহায় হাসান আল-আয়েজকে আবহায় ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায় আগাইলীকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল-আয়েজ বেদুঈনদের প্রস্তাবে সাড়া দিলে গোত্র নেতাদের নেতৃত্বে একটি

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী অভিযান চালায় এবং আবহা পূণঃদখল করেন। শহর রক্ষায় ইখওয়ানরা প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।(৭০) এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ইবনে সউদ তাঁর পুত্র ফয়সলের নেতৃত্বে আসীর থেকে ৫০০০ সৈন্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠান। সামান্য প্রতিরোধের পর ফয়সল আবহা পুণঃদখল করেন।(৭১) ফয়সল আবহায় আব্দুল আজিজ ইবনে ইব্রাহীমকে নতুন আমীর নিয়োগ করেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন লাভে সক্ষম হন।

হাসান আল-আয়েজ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে কয়েদী হিসেবে রিয়াদে পাঠানো হয়। ইবনে সউদ পুনরায় অসীম ধৈর্য্য ও উদারতার সাথে আল-আয়েজকে সাদরে গ্রহণ করেন। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের জন্য ইবনে সউদ তাঁকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আসীর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন।

শেষ পর্যন্ত আসীর সউদী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। যুবরাজ ফয়সল স্থানীয় জনগণের সাথে বন্ধুত্বের ও আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রশাসন চালায়। আসীরের জনগণ স্বাধীনভাবে সউদী রাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যবসায় বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ পান। আরবে প্রবাদ আছে যে, একজন তরুণ কৃষকের শুভ সংবাদ হলো মাঠে তার ভাল ফসল উৎপাদন।(৭২)

জওফ ও সাক্কার অধিকার {১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ / ১৩৪০ হিজরী}

হাইলের উত্তরে জওফ এবং সাক্কা মরুদ্যান। সিরিয়ার বিখ্যাত বেদুঈন সর্দার নুরী আশ শালানের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ফারহান। তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে থাকতেন। কিছুদিন পর তার পিতৃব্যের সঙ্গে বিবাদ বাধে। তখন তিনি ও তাঁর শালান গোত্র এবং রুয়ালার কিছু লোকজন নিয়ে নজদ চলে যান। নজদে তিনি হঠাৎ ধার্মিক হয়ে ওঠেন এবং ইখওয়ানের সাথে যোগ দেন। নুফুদের উত্তরের একটি মরুদ্যান আল-জওফের স্বাধীন আমীররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই শালান বংশ।(৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

হাইল সংলগ্ন সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সীমানা। হাইলের উত্তর পশ্চিমে ট্রান্সজর্ডান অঞ্চলের দিকে ওয়াদিস সিরহানের সীমানায় শালান বংশ বাস করতো।

ইবনে সউদ ওয়াদিস সিরহানে ইখওয়ান প্রচারক পাঠালে শালান বংশের বহু লোক ইখওয়ানে যোগ দেয়।

১৩৪০ হিজরী/১৯২২ সালের জুলাই মাসে ইখওয়ান জওফ বিজয়ে অগ্রসর হন। জওফের আমীর ফারহান ওয়াহাবী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জওফ শহরের দরজা ইখওয়ানে জন্য খুলে দেন এবং তারা শালান বংশের অবসান ঘটিয়ে জওফ দখল করেন।

বৃটেন ইখওয়ানের এ বিজয়ে শংকিত হয়। জওফ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। কারণ সেখানে বাগদাদ থেকে মিশরে যাত্রী কাফেলা অবস্থান করত। ইখওয়ান এর পর সাক্কার অধিকার করে হাইলের অপর প্রান্তে পৌছেন।

১৯২২ সনের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় ১৫০০ সৈন্য বিশিষ্ট ইখওয়ানের একটি দল ট্রান্সজর্ডানের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী বনী শাকির ও তারাইফ গোত্রদ্বয়ের উপর আক্রমণ চালায়।(৭৪) তারা গ্রাম দু'টির শিশু এবং নারী ব্যতীত সমস্ত লোককে হত্যা করে।(৭৫)

বৃটেনের ট্রান্সজর্ডানে মোতায়েন বিমান বাহিনী ইখওয়ানকে তাড়িয়ে দেওয়ার পূর্বেই তারা পশ্চাদাপসরণ করে।

বৃটিশ সরকার ট্রান্সজর্ডান ও ইরকের জন্য ম্যান্ডেট লাভ করেছিল এবং ইবনে সউদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে তাঁকে বার্ষিক ৬০,০০০ পাউন্ড ভর্তূকীও প্রদান করতো।(৭৬)

এভাবে ইবনে সউদও বৃটেন আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করার পন্থা খুজছিল। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, বিভিন্ন গোত্র সমূহের আনুগত্য নিশ্চিত করা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্রে সৃষ্টি। অপর দিকে পৃথক সত্ত্বা হিসেবে কুয়েতের অবস্থিতির ফলে এই সমস্ত অঞ্চলের সাথে ইবনে সউদের রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ অতি জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

তায়েফ বিজয় | ৫, সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ / ৭, সফর ১৩৪৩ হিজরী |

১৯১৯ সালে তারাবা যুদ্ধে পরাজিত শরীফ হোসাইন ও বিজয়ী ইবনে সউদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। ইবনে সউদের দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তিনি আরব উপদ্বীপের প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। শরীফ হোসাইন বৃটিশ সরকারের সমর্থন পুষ্ট বলে তখনও নিজেকে আরব দেশ সমূহের শাসক বলে মনে করতেন।

ইবনে সউদ ও শরীফ হোসাইন উভয়ই বৃটিশের আর্থিক এবং রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই কারণে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বিলম্বিত হয়। শরীফ হোসাইনের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা এই সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করে।

১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ কামাল আতাতুর্ক খিলাফত বিলুপ্তি করেন।(৭৭) শেষ ওসমানীয় খলিফা আব্দুল মজিদকে খিলাফত থেকে বহিস্কার করা হয়। এর ৩দিন পর অর্থাৎ ৭ই মার্চ ১৯২৪, ৩ রজব ১৩৪২ হিজরী কারো সাথে আলোচনা ছাড়াই শরীফ হোসাইন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর রাজ্য ট্রান্সজর্ডান সফরের সময় নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন।(৭৮) ফলে ইবনে সউদ ও তাঁর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।(৭৯)

শরীফ হোসাইনের এই খলিফা উপাধি গ্রহণে মুসলিম বিশ্ব বিশেষত ইখওয়ানের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।(৮০)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ/১৩৪০ হিজরী সনে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। নজদের ইখওয়ান হেজাজ সীমান্তে আক্রমণ চালায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলঃ-

১। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা;

২। উক্ত এলাকার বেদ'আত এবং শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ করা।

ফলে শরীফ হোসাইন নজদবাসীকে হজ্জ পালনে বাধা দেন। কিন্তু বৃটেনের মধ্যস্থতায় হজ্জ পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। পুনরায় শরীফ হোসাইন নজদবাসীকে হজ্জ পালনে নিষেধাজ্ঞা এবং কঠিন শর্তারোপ করেন। ইবনে সউদকে জওফ, তারাবা এবং খয়বার এলাকা ছেড়ে দেওয়ার শর্তারোপ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ইবনে সউদ উপরোক্ত শর্ত পালনে অস্বীকৃতি জানান। ফলে শরীফ হোসাইন পুনরায় নজদবাসীকে হজ্জ্ব পালনে বাধা দেন।(৮১)

১৯২২ সালের উকায়ের ও মুহাম্মারা সম্মেলনে নজদ-ইরাক, নজদ-কুয়েত, ট্রান্সজর্ডান, নজদ সীমানা নির্ধারণে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।(৮২) কিন্তু এতেও সম্পর্কের কোন উন্নতি হয় না।

ইখওয়ান কর্তৃক সংঘটিত ঘটনায় হাশেমীয়দের সাথে বিরোধের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইখওয়ানের দৃষ্টিতে হাশেমীরা আদর্শচ্যুত।(৮৩) মিসর ও ভারতের ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে পবিত্র নগরী, মক্কা মদীনা এবং হজ্জ্ব সংক্রান্ত বিষয়াদিতে শরীফ হোসাইনের প্রশাসন নীতির বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে।

382375

ইবনে সউদ শরীফ হোসাইনকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী হলেন না, যতক্ষণ না মুসলিম বিশ্ব নির্ধারিত করেন। ১৯২৪ সালের ২রা জুন ১৩৪২ হিজরী ইবনে সউদ রিয়াদে ওয়াহাবী এবং ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন ডাকলেন।(৮৪) তিনি তাঁর জনগণের পূর্ণ সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। সম্মেলনে ওলামা, শেখ এবং গোত্র প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ইবনে সউদের পিতা আব্দুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে শরীফ হোসাইনকে আক্রমণের পক্ষে ভোট দেন। সম্মেলনে বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে শরীফ হোসাইনের পাপকার্যের ফিরিস্তিসহ সংবাদ প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।(৮৫) উক্ত সম্মেলনে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ শরীফ হোসাইনের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেনঃ-

১। গত দু'বছর যাবৎ ইখওয়ান ও ওয়াহাবীদেরকে পবিত্র হজ্জ্ব পালন করতে দিচ্ছেনা।

২। তাঁর অবৈধ করারোপ।

৩। স্বৈরশাসন।

৪। পবিত্র নগরী সমূহে কুশাসন।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৫। অন্যায় বিচার।

আলেমগণ এ ব্যাপারে মতব্যক্ত করেন যে, হজ্জ্ব পালন নজদবাসীর মৌলিক অধিকার। সমঝোতা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে পারবে।(৮৬) উপরোক্ত অভিযোগনামা ইবনে সউদের দ্বিতীয় পুত্র ফয়সলের স্বাক্ষরে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে প্রেরণ করা হয়।(৮৭) বার্তাটির সামান্য সাড়া পাওয়া গেল।

নিম্নোক্ত শ্লোগানের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 'তাওয়াককালনা আলাল্লাহি ইলাল হেজাজ'(৮৮) 'আল্লাহর উপর ভরসা করে হেজাজ অভিমুখে যাত্রা করলাম'। ইবনে সউদ তাঁর উপদেষ্টা মিশরীয় হাফেজ ওয়াহাবার পরামর্শ নিলেন। তিনি ইবনে সউদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। হাফেজ ওয়াহাবা মন্তব্য করলেন, 'বিজয় ইবনে সউদের মুঠোর মধ্যে'।(৮৯)

ইবনে সউদ তাঁর নিয়মিত সেনাবাহিনী ও সংরক্ষিত ইখওয়ান বাহিনীকে সমবেত করলেন তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেনঃ-

১। প্রথম দলটি ইরাক সীমান্তে।

২। ট্রান্সজর্ডান যাতে করে আব্দুল্লাহ এবং ফয়সল তাঁদের পিতার সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে না পারে।

৩। বড় দলটি হেজাজের দিকে। তাদেরকে পথে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সোজা মক্কায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন।(৯০)

ইবনে সউদ ইখওয়ান নেতা ও উতায়বা শেখ সুলতান ইবনে বিজাদকে হেজাজ সীমান্তে মক্কার শরীফ হোসাইনের বাহিনীকে আক্রমণ এবং খালিদ ইবনে লুয়াইকে খুরমা থেকে মক্কার পথে পাঠালেন। মক্কার শরীফ হোসাইন তারাবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হন। বিপদের সময় বৃটেন রক্ষা করবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি একদা মন্তব্য করলেন 'আমি আক্রান্ত হলে বৃটেন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাঁদের কাছে আমার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছেড়ে দিলে তা অধিক নিরাপদ হবে'।(৯১)

Dhaka University Institutional Repository

ফলে যখন ইবনে সউদ ইখওয়ানকে পুনর্গঠিত করেন, তখন শরীফ হোসাইন তার গুরুত্ব দেননি। ইখওয়ান যখন অগ্রসর হচেছ তখন বৃটেন প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই করেননি।(৯২) খুরমা তায়েফের একটি শহর ও মরুদ্যান। তায়েফ ছিল সুজলা সুফলা। শহর প্রাচীর এবং সেনানীবাস দ্বারা নিরাপদ ছিল। মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো তায়েফে রাজ প্রাসাদ তৈরী করেন। বাদশা শরীফ হোসাইন স্বপরিবারে গ্রীষ্ম অবকাশের জন্য তায়েফ আসতেন।

১৯২৪ সালের আগস্টের শেষভাগে সন্ধ্যায় খালিদ ইবনে লুয়াইর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, শরীফ হোসাইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরীফ আলী সেনাবাহিনী প্রধান। তবে সেনা পরিচালনায় তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা।(৯৩) তিনি আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য তায়েফ আসছেন। খালেদ ইবনে লুয়াই ইবনে বিজাদের নিকট এখবর পৌঁছালেন।(৯৪)

ইবনে বিজাদ ইখওয়ান বাহিনী নিয়ে দ্রুত তায়েফ আক্রমণ করলেন। হোসাইনের পুত্র শরীফ আলীর নগর সেনারক্ষী ও সেনা ছাউনীর সৈন্যরা পালিয়ে যান।

শহরবাসী শরীফ আলীর দল ত্যাগ করেন। ইবনে বিজাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা শহরের দরজা ইখওয়ানের জন্য উন্মুক্ত করেন দেন।(৯৫)

ইখওয়ান বাহিনী পুলিশ ফাঁড়িতে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে অগ্রসর হন। তিনশত অধিবাসী হতাহত হন। শরীফ আলী আরাফাতের দিকে পালিয়ে যান।

ইত্যবসরে শরীফ হোসাইন তাঁর পুত্রের পরাজয়ের খবর পেয়ে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। শরীফ আলী মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী হাদ্দা নামক জায়গায় অবস্থান নেন।(৯৬) ইখওয়ান বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে শরীফ আলী বাহিনী মক্কায় পালিয়ে যান। ইখওয়ান বাহিনী ৭ই সফর ১৩৪৩ হিজরী/৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে তায়েফ নগরী দখল করেন।(৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

মক্কা বিজয় | ১৮ই, অক্টোবর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ / ৭ই, জমাদিয়াল উলা ১৩৪৩ হিজরী |

৭ই সফর ১৩৪৩ হিজরী(৯৮) ১৯২৪ সালে শরীফ হোসাইনের পুত্র শরীফ আলী তায়েফে পরাজিত হয়ে আরাফাতে পালিয়ে যান।(৯৯) শরীফ হোসাইন পুত্রের সাহায্যার্থে হাদ্দায় পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত সৈন্য ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনীর নিকট হাদ্দায় পরাজিত হয়। শরীফ আলী অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্য নিয়ে মক্কা রওয়ানা হন। ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনী পরাজিত শরীফ আলীর সেনাবাহিনীকে ধাওয়া করে। ইখওয়ান মক্কার হরম শরীফে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করতেন না।(১০০)

শরীফ আলী মক্কার অদূরে পরাজিত হয়ে জেদ্দা পালিয়ে যান। মক্কার শরীফগণ এবং মোতায়েনকৃত সৈন্যরাও জেদ্দায় পালিয়ে যায়। শরীফ হোসাইন মক্কায় ইবনে সউদের বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনি তায়েফ প্রত্যাবর্তনের ও চিন্তা করেছিলেন।(১০১) ২৬শে সফর ১৩৪৩ হিজরী/২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে তায়েফের নিকটবর্তী হাদ্দা যুদ্ধে ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনীর নিকট শরীফ হোসাইনের বাহিনী পরাজিত হন।(১০২) হাদ্দা যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর হেজাজের নেতৃবৃন্দ জেদ্দায় এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, শরীফ হোসাইন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শরীফ আলীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করবেন।(১০৩) হেজাজবাসী তাঁর দুঃশাসনে অতিষ্ট হয়ে ওঠেন।(১০৪) শরীফ হোসাইন অস্বীকৃতি জানালেও ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৪/৫ই রবিউল আউয়াল শরীফ আলীর অনুকূলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।(১০৫) ঐদিনই শরীফ আলীর হাতে হেজাজবাসী জেদ্দায় তাদের আমীর হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ শপথ নেন।(১০৬) শরীফ হোসাইন ২৪শে অক্টোবর হেজাজ ত্যাগ করে আকাবায় চলে যান।(১০৭) হেজাজবাসীর ধারণা ছিল তাদের নবনির্বাচিত আমীর শরীফ আলী নজদের সুলতান ইবনে সউদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং হেজাজবাসী শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। হেজাজবাসীর আনুগত্য স্বীকার করার পরই শরীফ আলী দ্রুত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।(১০৮) সেখানে ইবনে সউদের মক্কা-অভিযান প্রতিরোধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেন। এতদসত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

দু'শর বেশী সৈন্য সমাবেশ করতে অক্ষম হয়ে শরীফ আলী মক্কা ত্যাগ করে জেদ্দা পালিয়ে যান।

১৫ই রবিউল আউয়াল ১৩৪৩ হিজরী/১৩ই অক্টোবর ১৯২৪ সালে ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনী জিমায় (ZAMIYA زيمه) উপস্থিত হন। তাঁরা মক্কা অবরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।(১০৯) তারা জানতে পারলেন মক্কার শরীফরা জেদ্দায় পালিয়ে গেছেন। তখন সুলতান ইবনে বিজাদ ঘাতঘাত গোত্রের চারজন ইখওয়ানকে ইহরাম বস্ত্র পরিধান করে মক্কা প্রবেশের নির্দেশ দেন। পরবর্তী দিন খালেদ ইবনে লুয়াই এবং ইবনে বিজাদের নেতৃত্বে ইখওয়ান বাহিনী ইহরাম বস্ত্র পরিধান করতঃ রাইফেল নীচু করে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন।(১১০) এভাবে খালেদ ইবনে লুয়াইর নেতৃত্বে ইখওয়ানরা ১৭ই রবিউল আউয়াল ১৩৪৩ হিজরী/১৬ই অক্টোবর ১৯২৪ সালে বিনাযুদ্ধে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।(১১১)

খালেদ ইবনে লুয়াই ইবনে সউদের রিয়াদ হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত মক্কার আমীর নির্বাচিত হন।(১১২) ৮ই জমাদিয়াল উলা ১৩৪৩ হিজরী/৫ই ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে নজদের বাদশাহ ইবনে সউদ ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া(১১৩) পাঠরত পবিত্র মক্কার কাবা ঘরের বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করেন।(১১৪) ইবনে সউদ জীবনে প্রথমবার মক্কা পদার্পণ করেন।(১১৫) অতঃপর তিনি আল্লাহর শোকরিয়া হিসাবে সুরা নসর পাঠ করলেন।

ইবনে সউদ বিজয়ী বেশে নয় বরং হজ্জ যাত্রীদের সাধারণ পোশাকে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য ফয়সল আদ-দুবেশের নেতৃত্বে পর্যাপ্ত ইখওয়ান সেনাবাহিনী ছিল।(১১৬) তিনি মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

ইখওয়ান বাহিনী যদি মক্কা অভিযানের সময় জেদ্দা অভিযানে যাত্রা করতেন তবে সহজেই জেদ্দা দখলে সক্ষম হতেন। ইখওয়ান বাহিনী ইবনে সউদের রিয়াদ হতে আগমনের অপেক্ষা করেছিলেন। রবিউস সানীর প্রারম্ভে জেদ্দার নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় গমন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ান নেতা খালিদ ইবনে লুয়াই ও সুলতান ইবনে বিজাদের সাথে একটি সন্ধি স্থাপন করা। ইখওয়ান নেতৃদ্বয় শরীফ আলীকে দেশত্যাগ অথবা যুদ্ধ করার শর্তারোপ করেন।(১১৭)

ইত্যবসরে শরীফ আলী সুলতান আবদুল আজিজের সাথে (তারের মাধ্যমে) যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি সব বিরোধ নিরসন ও সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য একটি সম্মেলন ডাকার আহ্বান জানান। এর সাথে আরও একটি শর্তারোপ করেন যে, ইখওয়ান বাহিনীকে হেজাজ ত্যাগ করতে হবে। ইবনে সঊদ প্রত্যুত্তরে শর্তারোপ করেন যে, 'আপনার সাথে আমার কোন সন্ধির প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা আপনার পিতা হেজাজ শাসনে তাঁর গোত্রকেই উত্তরাধিকার মনোনীত করেছেন'। হেজাজ সরকার ভারতের খেলাফত কমিটি এবং ফিলিস্তিনের মজলিসে আলার মাধ্যমে সন্ধি এবং ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টার ব্যর্থ হন। অপর দিকে ইবনে সঊদ মুসলিম বিশ্বের সমর্থন লাভে সক্ষম হন। তিনি হেজাজ থেকে শরীফদেরকে বিতাড়িত করারও ঘোষণা দেন। কারণ তারা ইসলামের ঐতিহ্য ধ্বংস এবং পবিত্র নগরীদ্বয়ের পবিত্রতা নষ্ট করেছেন।(১১৮) তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, কুর'আন সুন্নাহ অনুসারে হেজাজ শাসিত হবে।(১১৯) এ ব্যাপারে নজদের সুলতানের কোন মতবিরোধ থাকবে না। 'আমি আন্তর্জাতিক সন্ধি মেনে চলবো'।(১২০)

জেদ্দা অভিযান | ৪ঠা, ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ / ৬ই, রবিউসসানি ১৩৪৪ হিজরী |

৬ই রবিউস সানী ১৩৪৪ হিজরী/৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে সুলতান আব্দুল আজিজ মক্কার উদ্দেশ্যে রিয়াদ ত্যাগ করেন। পথে শহরবাসী ও গ্রামবাসীরা তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও উপঢৌকন প্রদান করেন। ৭ই জমাদিয়াল উলা ১৩৪৪ হিজরী শাহী দলটি ওমরার ইহরাম অবস্থায় পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন।

ওমরাহ পালন শেষে মক্কার যাবতীয় কাজ সুষ্ঠভাবে সমাধা করলেন। অতঃপর শরীফ আলীর পক্ষে এবং ইবনে সঊদের মধ্যে সন্ধি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ আলী জেদ্দায় অবস্থা করতেন। তাই আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি।(১২১) ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনীর অগ্রাভিযানে জেদ্দার দক্ষিণাংশ কানফিদাহ (QUNFIDH قنفذه) দখল করেন। জেদ্দার দক্ষিণাংশ রাবেগ (RABIG رابغ) এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মক্কা এবং জেদ্দার মধ্যবর্তী স্থান চলাচলযোগ্য করলেন। এভাবে ইবনে সউদের বাহিনী উভয় দিক থেকে জেদ্দা অবরোধ করেন।(১২২) ইখওয়ান বাহিনী আলী ইবনে হোসাইনকে জেদ্দার অবশিষ্ট দিক থেকে অবরোধের চেষ্টা করেন।

ইতিমধ্যে শরীফ আলীর ভাই ট্রান্সজর্ডানের আমীর আব্দুল্লাহ ৩০০ সেচ্ছাসেবক তাঁর সাহায্যার্থে পাঠান।(১২৩) শরীফ উক্ত সাহায্য প্রাপ্তির পর জেদ্দার উভয় দিক থেকে আরব সাগর পর্যন্ত ছয় মাইল প্রতিরোধ পরিখা খনন করেন।(১২৪) ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনী জেদ্দার মধ্যবর্তী অঞ্চল শরীফ আলীর প্রতিরোধ মূলক খন্দক অবরোধ করেন। তখন ইখওয়ানরা বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এ সময় ইবনে সউদের বাহিনী ও শরীফ আলীর মধ্যে সন্ধির চেষ্টা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়।

মদিনা অবরোধ

ইতিমধ্যে ইখওয়ান বাহিনীর অন্য একটি দল সালেহ ইবনে আদল এর নেতৃত্বে মদীনা অবরোধ করেন।(১২৫) রজব মাসের প্রথম দিকে বদর, আল ওয়াজহা ( ) এবং হানাকিয়ার (HANAKIYA حناكية) উপর ইবনে সউদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে সউদ হায়েল থেকেও সাহায্য পান। এসময় হেজাজের সৈন্য সংখ্যা চৌদ্দ হাজারে উন্নীত হয়।(১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

আমীর মুহাম্মদের মদীনা প্রবেশ

মদীনাবাসী পত্রযোগে ইবনে সউদকে মদীনার দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা অন্য কাহারো কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান।(১২৭) ইবনে সউদ মদীনা বিজয়ে ফয়সল আদ-দুবেশের পরিবর্তে তাঁর পুত্র মুহাম্মদের নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ১০ মাস অবরোধের পর(১২৮) ১৯ জমাদিয়াল উলা(১২৯)/১৫ই জমাদিয়াল উলা ১৩৪৪ হিজরী(১৩০) ৫, ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে মদীনা অর্পণ করা হয়।(১৩১) ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে ইবনে সউদের পুত্র মুহাম্মদ সউদী বাহিনীর প্রধান হিসেবে পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদে নববীতে নামাজ আদায়ের পর আমীর হিসেবে মদীনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।(১৩২)

অপর দিকে জেদ্দা অবরোধ অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন গুজবের কারণে জেদ্দাবাসী স্বস্তি পাচ্ছিল না। ইবনে সউদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর সেনাবাহিনীর ক্ষতি সাধন না করা। জেদ্দায় বসবাসকারী বিদেশীদের যেন ক্ষতি না হয়। যুদ্ধ ছাড়াই শরীফ আলীর আত্মসমর্পণের অপেক্ষায় থাকেন।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে জেদ্দায় বৃটেনের রাষ্ট্রদূত ( ) গিলবার্ট ক্লাইটন শরীফ আলীর আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য ইবনে সউদের কাছে পত্র পাঠান।(১৩৩)

অপর দিকে জেদ্দার শীর্ষস্থানীয় নেতা আব্দুল্লাহ আলী রেজার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শরীফ আলীকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন।(১৩৪) ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৫ ১লা জমাদিউস সানী ১৩৪৪ হিজরী বৃটিশ প্রতিনিধি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭টি শর্ত সম্বলিত রাগেনামায় ( ) ইবনে সউদের নিকট শরীফ আলী আত্মসমর্পণ করেন।(১৩৫) ১৮ই ডিসেম্বর শরীফ আলীর ভাই আব্দুল্লাহ জেদ্দা থেকে পালিয়ে ট্রান্সজর্ডানে যান।(১৩৬) তারপর ২০শে ডিসেম্বর রবিবার বৃটিশ জাহাজ এইচ.এম.এস. কর্নফ্লাওয়ার (HMS CORN FLOWER) যোগে তাঁর ভাই বাগদাদের আমীর ফয়সলের নিকট চলে যান।(১৩৭) ১০ই জমাদিয়াস সানী ১৩৪৪ হিজরী(১৩৮) ২৩শে ডিসেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৫ সালে ইবনে সউদ বিজয় বেশে জেদ্দা প্রবেশ করেন।(১৩৯) জেদ্দার শেখ মোহাম্মদ নসীফের ভবনে রাজকীয় মেহমান হিসেবে এক রাত বিশ্রাম নেন।(১৪০) জেদ্দার সর্বস্তরের জনগণ তাঁকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানান।(১৪১)

হাজী আব্দুল্লাহ আলী রেজা তখন জেদ্দার কায়েম মোকাম (গভর্ণর) ছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জেদ্দা শহরের চাবি ইবনে সউদের নিকট হস্তান্তর এবং কায়েম মোকাম পদ থেকে পদত্যাগ করেন। হাজী আলী রেজা সুলতান ইবনে সউদকে বললেন 'আমার দায়িত্ব সমাপ্ত'। ইবনে সউদ প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আপনার দায়িত্ব মাত্র শুরু'। ইবনে সউদ তাঁকে জেদ্দার গভর্ণর হিসেবে পুনরায় নিয়োগ দান করেন।

অতঃপর তিনি জেদ্দা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর জীবনে প্রথমবারের মত হজ্জব্রত পালন করেন।(১৪২) এভাবে সমস্ত হেজাজ দখল করবার পর ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখ ইবনে সউদ হেজাজের বাদশা এবং নজদের সুলতান উপাধিতে ভূষিত হন।(১৪৩) শরীফ হোসাইন সাইপ্রাসে নির্বাসিত হন এবং ১৯৩১ সালে আম্মানে পরলোক গমন করেন।(১৪৪) এভাবে হেজাজে হাশেমী বংশের অবসান ঘটে।(১৪৫)

১৯০২ হতে ১৯১২ পর্যন্ত আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ নজদের রশীদী রাজ পরিবার, মক্কার শরীফ হোসাইন এবং তুর্কী সুলতানের বিরোধীতার সম্মুখীন হন। কুয়েতের আমীর শেখ মোবারক ইবনে সউদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত হন। শত্রু দ্বারা পরিবেস্টিত সউদী রাজ বংশের ওয়াহাবী ইমাম ও নজদের আমীর ইবনে সউদ বিচলিত হন। তিনি এ প্রচন্ড শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ও সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ধর্ম ভিত্তিক সামরিক শক্তি হিসেবে ইখওয়ান আন্দোলন শুরু করেন।(১৪৬) তিনি ইখওয়ান প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ ও সউদী রাজবংশকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। তিনি ইখওয়ানের সাহায্যে ১৯১৩ সালে পারস্য উপসাগরের তুর্কী অধিকৃত অঞ্চল আল-হাসা দখল করেন। ১৯১৫ সালে জেরাব যুদ্ধে ও

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ানের কৃতিত্ব ছিল প্রসংশনীয়। ১৯১৯ সালে তারাবা যুদ্ধে ইখওয়ান বাহিনী বিজয়ী হন। ১৯২০ সালে জাহরা যুদ্ধে জয়লাভ এবং কুয়েতকে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ করতে ইখওয়ান বাহিনীর ভূমিকা ছিল বীরত্বপূর্ণ।

ইখওয়ান বাহিনী ১৯২১ সালে রশীদ পরিবারকে উৎখাত এবং সমগ্র নজদ অঞ্চল দখল করেন। বৃটেন নজদের আমীর হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেন। তুরস্কের খিলাফত বিলুপ্তির ৩ দিন পর ১৯২৪ সালে মক্কার শরীফ হোসাইন আরব দেশ সমূহের খলিফা উপাধি গ্রহণ করলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কয়েক পর্যায়ে এই সংঘর্ষ চলেঃ

১। আগষ্ট ২৪, ১৯২৪ সালে ইবনে সউদের ইখওয়ান বাহিনী হেজাজের তায়েফ আক্রমণ ও ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে উহা দখল করেন।

২। ৩রা অক্টোবর ১৯২৪ সালে মক্কার শরীফ হোসাইন পদত্যাগ করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্র আলীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করেন।

৩। অক্টোবর ১৩ তারিখ ১৯২৪ সালে ইখওয়ান সৈন্যদল মক্কা দখল করেন।

৪। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত ইখওয়ান সৈন্য বাহিনী জেদ্দা অবরোধ করেন।

৫। ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে ইখওয়ানরা মদীনা দখল করেন।

৬। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে শরীফ হোসাইন পুত্র শরীফ আলী পদত্যাগে বাধ্য হন।

৭। ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে ইখওয়ান বাহিনী জেদ্দা দখল করেন।

এভাবে তারা সমস্ত হেজাজ দখল করতে সমর্থ হন। ইখওয়ান বাহিনী অসাধারণ কর্মদক্ষতায়, রণনৈপুন্যে ও তওহীদের মূলমন্ত্রে আত্মনিবেদিত ছিল। অনুরূপভাবে ইবনে সউদের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ছিল। ইখওয়ান বাহিনী ইবনে সউদের সাহায্যে এগিয়ে না এলে সমগ্র হেজাজ দখল করা সম্ভব হতো না।

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ানের বেসামরিক কার্যক্রম

ধর্মীয় কার্যাবলী—

হিজরা সমূহে ধর্মীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইখওয়ানদের ইসলামের ঐ সকল মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয় যা মহানবী (সঃ) ও সালফে সালেহীনের যুগে শিক্ষা দেয়া হতো। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের যেই শিক্ষা ছিল, ইহা ছিল সেই ধরনের শিক্ষা।(১৪৭) তারা সকল প্রকার বেদ'আতের প্রচন্ড বিরোধিতা করতো। এরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে পাপকার্য মনে করতো। কারণ উহা সরাসরি তেল কিংবা মোমবাতি ব্যতীত আলো দান করে। মস্তকাবরণে এবং মস্তক রজ্জুর পরিবর্তে শুভ্র পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে।

হিজরা সমূহে প্রচার কার্য পরিচালিত হয় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের একজন বংশধর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতিফের তত্ত্বাবধানে।(১৪৮) তিনি ইখওয়ানদের মধ্যে হাম্বলী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি যুল-কাদা, ১৩৩২ হিজরী/সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে অন্যান্য আলেমদের সমন্বয়ে একটি ঘোষণা জারী করেন। ঐ ঘোষণায় হিজরাবাসীদেরকে কিছুটা নমনীয় পন্থা অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। আলেমগণ মতামত দিলেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে মস্তকাবরণের রজ্জু ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইবনে সউদ ঐ সময় ইখওয়ানদের উদ্দেশ্যে আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেন যে, সুন্নী ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।(১৪৯) যদিও তিনি ও তাঁর সরকার হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি আরও ঘোষণা দিলেন যে, ইখওয়ানদের নিকট তাদের সেনা ছাউনীতে বিভিন্ন পুস্তক থাকতে পারবে। যেমন ওয়াহাবী মতবাদের আধ্যাত্মিক ওস্তাদ ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়ার পুস্তক সমূহ ও রাখতে পারবে। তবে ইখওয়ানরা এ ধরনের নমনীয়তা ও সহনশীলতা অবলম্বনের উপদেশ প্রায়ই উপেক্ষা করতো। হিজরা সমূহে এই ধর্মীয় প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ান ও অন্যদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ও আইনজ্ঞ নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।(১৫০)

ইখওয়ানের নেতা হয়ে ইবনে সউদ ১৯১৬ সালে প্রচারিত এক অধ্যাদেশে বেদুঈন গোত্রগুলিকে ইখওয়ান আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক আন্দোলনের নেতা হিসেবে তাঁর হেফাজতে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেন।(১৫১)

সামাজিক কার্যাবলী—

ইবনে সউদ জন্মগতভাবে শহরবাসী হলেও বেদুঈনদের মধ্যে অনেকদিন অতিবাহিত করেন। যাতে তাদেরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পান। বেদুঈনরা গোত্র কলহে জড়িয়ে যুগ যুগ ধরে আরবদেশকে বহুধাবিভক্ত করে দিয়েছিল। তিনি গোত্রীয় কলহ বন্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালান।(১৫২) বেদুঈনদের প্রতিভা ভাল কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তা হলো বিভিন্ন হিজরায় তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদান করত অধিকতর নির্ভরযোগ্য নাগরিকে পরিণত করা। এ বিপ্লবী পদ্ধতি বেদুঈনদের মৌলিক পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এরূপ একটি জীবন পদ্ধতি অবলম্বনের পথ আল্লাহর করুনা দ্বারা প্রশস্ত হলো।(১৫৪) এভাবে তাদেরকে একটি সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এরা ইবনে সউদের নিজস্ব বাহিনী ছিল।(১৫৫)

কৃষিকাজ—

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে সউদ বাসস্থান ভিত্তিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। এই ছাউনীটির নাম ছিল আরতাবিয়া। কৃষি ছাউনীটি (হিজরা) কাসীম প্রদেশে অবস্থিত। এর অধিবাসীগণ প্রধানত মুতায়ন গোত্র হতে সংগৃহীত।

চাষাবাদের ভূমিগুলি পানির কোন উৎসমুখের সন্নিকটে ছিল। ১০ বছরের মধ্যে ৭০টি হিজরা প্রতিষ্ঠিত হয়. হিজরাবাসীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। বেদুঈন কৃষক।

২। মুতাওয়াবী নামে অভিহিত ধর্ম প্রচারকগণ ও

৩। বণিক শ্রেণী।

হিজরায় কৃষি পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন ধরনের। কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সরঞ্জাম সরবরাহ, চারা লাগানোর ব্যাপারে জরুরী উপদেশ ও পরামর্শ দানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষিবিদ নিয়োগ করা হয়। বেদুঈনদের জন্য তাবুর পরিবর্তে মাটির ঘর নির্মাণ করা হয়। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁরা ব্যবসায়ীও বটে।(১৫৬) উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

ইখওয়ানের পোষাক, আচরণ, খাদ্যাভাস—

ইখওয়ান আন্দোলনের সদস্যবৃন্দ পোশাকে ও আহারে অত্যন্ত সরল ছিলেন। ব্যক্তিগত আচরণে তারা এ পন্থা অবলম্বন করেন যা মহানবী (সঃ) এর বলে বিশ্বাস করা হয়। গোঁফ ছোট এবং শ্মশ্রু দীর্ঘায়িত রাখতো। বেদুঈনদের চিরাচরিত মস্তকাবরণের পরিবর্তে শুভ্র পাগড়ী ব্যবহার করতেন।(১৫৭) এ আন্দোলনের বাইরের মুসলমানদের সালামের উত্তর এরা দিত না। কোন বিদেশীদের সংস্পর্শে এসেছে এমন কোন আরবের সাক্ষাৎ হলে ইখওয়ানের সদস্যরা দুই হস্তদ্বারা নিজের চোখ মুখ ঢেকে রাখতো।(১৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. H.C. Armstrong, Lord of Arabia, London, 1934, P. 88.

২. ইব্রাহীম ইবনে ছালেহ ইবনে ঈসা, তারীখে বায়দুল হাওয়াদেছ আল-ওয়াকেয়াতু ফী নজদ, রিয়াদ, ১৩৮২ হিজরী, পৃঃ ১৯৮ ।

ابراهيم بن صالح بن عيسي - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد - الرياض: ١٣٨٢ه،ص١٩٨

৩. Mohammad Ahnana, Arabia Uniied, London, 1980, P. 57.

৪. Sk. Mohammad Iqbal, Emergence of Saudi Arabia, Kashmir, 1977, P. 74.

৫. J.B. Philby, Saudi Arabia, London, 1955, P. 272.

৬. Almana, Ibid., P. 57.

৭. ছালাহউদ্দীন মুখতার, তারীখে আল-মামলাকাতুল আরাবিয়াতুস সাউদীয়া, ২য় খন্ড, বৈরুত, ১৩৯০ হিজরী, পৃঃ ১৬৪ ।

صلاح الدين مختار ، تاريخ المملكة العربية السعودية - بيروت: ١٣٩٠ه ، ص/١٦٤

৮. Almana, Ibid, P. 57.

৯. Gary Troeller, The birth of Saudi Arabia, London, 1976, P. 86.

১০. Ibid, P. 250.

১১. শেখ মুহাম্মদ হায়াত, তারীখে সউদী আরব (উর্দু) লাহোর, ১৯৯২, পৃঃ ২৩১ ।

১২. Robert Lacy, The Kingdom, London, 1981, P. 150.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ডঃ মদীহা আহম দরবেশ, তারীখে দওলাতুস সাউদীয়া, রিয়াদ, ১৩৯০ হিজরী, পৃঃ ১২।

الدكتور مديحه احمد درويش - تاريخ الدولة السعودية، الرياض، ١٣٩٠ه، ص١٢

১৪. Almana, Ibid, P. 63.

১৫. Troeller, Ibid, P. 130-31.

১৬. Ibid.

১৭. Lacy, Ibid, P. 147.

১৮. Howarth David, The Desert King, London, 1964, P. 107.

১৯. Ibid., P. 148.

২০. Ibid.

২১. David, Ibid. P. 108.

২২. Jacques Benoist, Arabian Destiny, London 1957, P. 138.

২৩. Lacy, Ibid, P. 150.

২৪. Ibid., P. 150.

২৫. Benoist, Ibid. P. 145.

২৬. Almana, Ibid, P. 67.

২৭. Ibid., 67.

২৮. Lacy Ibid., P. 150.

২৯. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯।

৩০. Troeller, Ibid., P. 170.

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আমীন সাঈদ, তারীখুদ দাউলাতিস সাউদীয়া, ২য় খন্ড, বৈরুত, ১৯৬৪, পৃঃ ১২৩।

أمين سعيد- تاريخ الدولة السعودية المجلد الثاني - بيروت: ١٩٦٤م، ص/١٢٣

৩২. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

৩৩. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৩৪. Almana, Ibid, P. 273.

৩৫. H.R.P. Dickson, Kuwait and her Neighbours, London: 1957, P. 253.

৩৬. Ibid. P. 254.

৩৭. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

৩৮. Almana, Ibid, P. 237.

৩৯. Dickson, Ibid., P. 225.

৪০. Almana, Ibid, P. 237.

৪১. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।

৪২. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।

৪৩. Dickson, Ibid., P. 257.

৪৪. Ibid. P. 257.

৪৫. Lacy, Ibid, P. 196.

৪৬. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯।

৪৭. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

৪৮. Armstrong, Ibid, PP. 191-92.

৪৯. Howarth David, The Desert King, London, 1964, P. 8.

৫০. Jacques Benoist-mechin, Arabian Destiny, London. 1957, P. 140.

Dhaka University Institutional Repository

৫১. Ibid. P. 140.

৫২. Ibid. P. ??.

৫৩. Ibid. P. 142.

৫৪. Ibid. P. 143.

৫৫. David, Ibid, P. 110.

৫৬. Armstrong, Ibid, PP. 193.

৫৭. Ibid.

৫৮. David, Ibid, P. 110.

৫৯. Ibid.

৬০. Ameen Rihani, Ibn Saud of Arabia, London, 1928, P. 173.

৬১. Muhammad Asad, the Road ot Mecca, London: 1954, P. 251.

৬২. Ibid. P. 143.

৬৩. Armstrong, Ibid, P. 194.

৬৪. Benoist, Ibid, P. 143.

৬৫. Armstrong, Ibid, P. 194.

৬৬. Benoist, Ibid, P. 143.

৬৭. Lacy, Ibid, P. 165.

৬৮. Benoist, Ibid, P. 173.

৬৯. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪ ।

৭০. Rihani, Ibid, P. 174.

৭১. Lacy, Ibid, P. 165.

Dhaka University Institutional Repository

৭২. Almana, Ibid, P. 70.

৭৩. Asad, Ibid, P. 386.

৭৪. Armstrong, Ibid, P. 198.

৭৫. Benoist, Ibid, P. 155.

৭৬. Lacy, Ibid, P. 171.

৭৭. Benoist, Ibid, P. 158.

৭৮. David, Ibid, P. 141.

৭৯. Philby, Ibid, P. 286.

৮০. Almana, Ibid, P. 70.

৮১. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

৮২. মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।

৮৩. Encyclopeadia Islam vol-III, P. 332.

৮৪. ডঃ মাদীহা আহম দরবেশ, তারীখুদ দওলাতিস সাউদীয়অ, রিয়াদ, পৃঃ ১০৪।

الدكتور مديحه احمد درويش - تاريخ الدولة السعودية، الرياض، ص/١٠٤

৮৫. Armstrong, Ibid, PP. 217-218.

৮৬. Lacy, Ibid, P. 186.

৮৭. Armstrong, Ibid, P. 218.

৮৮. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪.

৮৯. Armstrong, Ibid, P. 219.

৯০. Bonoist, Ibid, P. 158.

৯১. Assah Ahmed, Miracle of the Desert Kingdom,London, 1973, P. 36.

Dhaka University Institutional Repository

৯২. Bonoist, Ibid, P. 159.

৯৩. Ibid.

৯৪. Armstrong, Ibid, P. 220.

৯৫. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪.

৯৬. Toeller, Ibid, P. 218.

৯৭. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪.

৯৮. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮.

৯৯. Almana, Ibid., P. 272.

১০০. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪ ।

১০১. ঐ ।

১০২. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬

১০৩. Philby, Ibid, P. 287.

১০৪. Sk. Mohammad Iqbal, Saudi Arabia, Kashmir, 1986, P. 23.

১০৫. Troeller, Ibid, P. 299.

১০৬. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮ ।

১০৭. The Hostilities in the Hejaz, the Near East and India, XXVII, 339, Nov. 1925, P. 647.

১০৮. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭ ।

১০৯. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫ ।

১১০. Lacey, Ibid., P. 190.

১১১. আল-খাতীব, পৃঃ ৬৯ ।

১১২. Lacey, Ibid., P. 190.

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. Almana, Ibid., P. 1.

১১৪. হাফেজ ওয়াহবা, জাযীরাতুল আরব ফীল করনিল ইশরীন, মিশর, ১৩৮৭ হিজরী, পৃঃ ৬৭০।

حافظ وهبه - جزيرة العرب في قرن العشرين : القاهرة،١٣٨٧ ص/٦٧.

১১৫. Almana, Ibid., P. 72.

১১৬. Ibid.

১১৭. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

১১৮. ঐ, পৃঃ ২৩৬।

১১৯. Philbi, Ibid, P. 290.

১২০. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

১২১. ঐ।

১২২. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

১২৩. Lacey, Ibid., P. 192.

১২৪. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

১২৫. ঐ, পৃঃ ১৭৫।

১২৬. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।

১২৭. Philbi, Ibid, P. 287.

১২৮. হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।

১২৯. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

১৩০. উদ্মুল কুরা ২য়া জামাদিউসসানী, ১৩৪৪ হিজরী, ১৮, ডিসেম্বর, ১৯২৫.

১৩১. Philby, Ibid, P. 290.

১৩২. Lacey, Ibid., P. 198.

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।

১৩৪. Lacey, Ibid., P. 199.

১৩৫. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

১৩৬. মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম কাদেরী, তারীখে নজদ ও হেজায (উর্দু), লাহোর, ১৩৯৮ হিজরী, পৃঃ ২১৩।

১৩৭. Lacey, Ibid., P. 199.

১৩৮. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

১৩৯. Lacey, Ibid., P. 199.

১৪০. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১।

১৪১. Philby, Ibid. P. 290.

১৪২. Almana, Ibid, P. 75.

১৪৩. Philby, Ibid. P. 290.

১৪৪. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪।

১৪৫. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

১৪৬. Philby, Ibid. P. 291.

১৪৭. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১৪৮. খায়রুদ্দিন আযযিরিকলী, আল-আলাম, কায়রো, ১৯৫৯, পৃঃ ১১০।

১৪৯. আল-ওয়াজীয, ফী সীয়াতিল মালেক আব্দুল আযিয, বৈরুত, ১৩৯২, হিজরী, পৃঃ ২১৭।

১৫০. Asad, ibid, P. 174.

১৫১. Dickson, Ibid, P. 108.

১৫২. আল-আবুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩. ঐ, পৃঃ ৬০৯।

১৫৪. ঐ, পৃঃ ৬১০।

১৫৫. Al-Farsy, Ibid, P. 7.

১৫৬. Encyclopeaedia Islam, Vol-III, P. 10.

১৫৭. D. Vander Menlen: the Wells of the Ibn Saud, London, 1957, P. 65.

১৫৮. Asad, Ibid, P. 236.

১৫৯. William Kenneth, Prince of Arabia, London, 1965, P. 157.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইখওয়ানের বিদ্রোহ

সমগ্র আরব উপদ্বীপে সউদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করার মূখ্য ভূমিকা ছিল ইখওয়ানের। ১৯২৭ সালে জেদ্দা চুক্তির মাধ্যমে সউদী আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।(১) কালক্রমে বিভিন্ন কারণে ইখওয়ান আব্দুল আজিজ বিন সউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইখওয়ান এবং আব্দুল আজিজ বিন সউদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ সমূহঃ

১। ইখওয়ান কর্তৃক অন্যকে তাদের মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করা ইবনে সউদ সমর্থন করেন নি।

২। ১৯২২ সাল পর্যন্ত হাসা ও কাতিফের শিয়াদের নিজ গৃহাভ্যন্তরেও ধুমপান করতে দেওয়া হয়নি। ইবনে সউদের চাপের মুখে তারা এই কঠোরতা শিথিল করতে বাধ্য হয়।(২) হেজাজের অন্যান্য জনসাধারণকে ও গৃহাভ্যন্তরে ধুমপান করতে অনুমতি দেওয়া হয়।(৩)

৩। ১৯২৪ সালে মক্কা বিজয়ের পর তাদের কঠোর মতাদর্শ অনুযায়ী মক্কার বহু মাযার ধ্বংস করে। এতে মুসলিম বিশ্বে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইবনে সউদ যখন হেজাজের জনসাধারণের প্রতি নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করেন তখন এক সময়ে ইখওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

৪। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রদত্ত এক ভাষণে ফয়সল আদ-দুবেশ মক্কায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের হুমকি প্রদর্শন করেন।(৪) ইখওয়ান বিভিন্ন সময় সীমান্ত এলাকায়

Dhaka University Institutional Repository

লুটতরাজ করত। ইবনে সউদ নভেম্বর ১৯২৫ সালে বৃটেনের সাথে বাহরা ও হাদ্দা চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে বৃটেন ইরাক ও ট্রান্সজর্দানের পক্ষে স্বাক্ষর করে। উভয় চুক্তিরই মূল উদ্দেশ্য ছিল লুটতরাজ বন্ধ এবং ইখওয়ানের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করা। হাদ্দা চুক্তিতে নজদ ও ট্রান্সজর্দানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়।

৫। ইখওয়ান কর্মীগণ ১৯২৬ সালে হজ্জের মওসুমে পুনরায় এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা মিসরীয় হজ্জ যাত্রীদের একটি কাফেলার উপর এই কারণে প্রস্তর নিক্ষেপ করে যে, তাদের মাহমাল* বহন ও এতদসঙ্গে পরিচালিত সামরিক মহড়া বেদআত।** মিসরীয়গণ এর প্রতিবাদ স্বরূপ নজদ হতে আগত হজ্জ যাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। যার ফলে কিছু লোক নিহত হয়।(৫)

৬। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একদল ইখওয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে ইরাকের অভ্যন্তরে একটি নিরীহ গোত্রের উট ও অন্যান্য সম্পত্তি লুন্ঠন করে। এতে কিছু লোক হতাহত হয়। ইংরেজ কর্মচারী জন গ্লাব কর্তৃপক্ষকে সীমান্তের নিকটবর্তী বুসাইয়া নামক স্থানে একটি পুলিশ ফাঁড়ী নির্মাণ করতে বলে।(৬) গ্লাবের সুপারিশ অনুসারে সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে ১২ জন শ্রমিক বুসাইয়ায় পুলিশ ফাঁড়ী নির্মাণের জন্য গমন করে। এই ফাঁড়ী ইখওয়ানের তৎপরতার পথে প্রতিবন্ধক মনে করে তারা ইবনে সউদের নিকট ফাঁড়ী ভেঙ্গে ফেলার দাবী জানায়। ইবনে সউদ ইরাকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করেন আল-উকায়েরে স্বাক্ষরিত চুক্তির ১নং প্রটোকল অনুযায়ী সীমান্তের নিকটবর্তী কোন দুর্গ নির্মাণ করা যাবে না।(৭)

গ্লাব উত্তরে বলেন, বুসাইয়া থেকে নজদ সীমান্ত আট মাইল দূরে। অপর দিকে বুসাইয়া সামরিক দুর্গ নহে বরং একটি পুলিশ ফাঁড়ি।(৮) তখন ইখওয়ানের সদস্যবৃন্দ নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

৭। ১৯২৫ সালে হেজাজ জয়ের পর তিনি তার রাজ্যকে আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবেশী ও বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য যোগাযোগ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজনমত কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেন। ইখওয়ান সদস্যারা এসব ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধিতা করে। কারণ তাদের মতানুযায়ী এসব কিছু ছিল বেদআত। ইখওয়ানের সদস্যগণ ইখওয়ান নয় এমন বেদুঈনদের সম্পত্তি লুন্ঠন করে এবং কখনও কখনও তাদেরকে হত্যা করে।

৮। ১৯২৬ সালে আল-আরতাবিয়া নমক স্থানে অনুষ্ঠিত ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয়ঃ-

(১) জাকাতের অতিরিক্ত যে কর ইবনে সউদ গোত্র সমূহের নিকট হতে আদায় করে তা বন্ধ করতে হবে।

(২) মোটর গাড়ী বেতার যন্ত্র, টেলিগ্রাফ ও বিধর্মীদের আবিষ্কৃত অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(৩) ইবনে সউদ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিশরে পাঠান। ইখওয়ান মিশরকে একটি বিধর্মী শাসিত দেশ মনে করতেন।

(৪) ইবনে সউদ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ফয়সলকে বিলাত পাঠান। ইখওয়ানের মতে ইংল্যান্ড বিধর্মীদের দেশ।

(৫) ইবনে সউদ কর্তৃক ইরাক এবং ট্রান্সজর্দানের বেদুঈনদের পশুপালন করার অনুমতি দান ইখওয়ান সমর্থন করে না।

(৬) ইবনে সউদ কুয়েতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষেধ করেন। ইখওয়ানের মতে কুয়েতের জনগণ যদি বিধর্মী হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি তারা বিধর্মী না হয় তাহলে কেন এই নিষেধাজ্ঞা?

(৭) আল-হাসা এবং কাতিফের শিয়াদের বলপূর্বক সুন্নীমতে দীক্ষিত করতে হবে।(৯)

এইসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইবনে সউদ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে রিয়াদে ইখওয়ান আলেম ও নেতাদের এক সভা ডাকেন। এই সভায় প্রায় ৩০০০ আলেম ও নেতা সমবেত হন।(১০) উক্ত সভায় তিনি ইমাম বা আমীরের অধিকার বলে নয়, বরং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে চান। তিনি আলেমদের উপরে তাঁর বিচারের ভার দেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে মানতে রাজী হন। এরপর আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইবনে সউদকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে একই সঙ্গে তারা ইখওয়ানেরও কিছু সুবিধা ও অধিকার দানের ঘোষণা করেন। ইখওয়ানের অপর দুই নেতা সুলতান ইবনে হুমায়েদ এবং জায়দান ইবনে হিসলায়েন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন নি। সুতরাং বিদ্রোহের অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইবনে সউদ বুসাইয়া ফাঁড়ীর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে ১৯২৭ সালের ৫ই নভেম্বর ইখওয়ান আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক মুতায়র গোত্রের নেতা ফয়সল আদ-দুবেশের সহকারী শেখ মুতলুক আল-সুরের নেতৃত্বে একদল ইখওয়ান বুসাইয়া ফাঁড়ি আক্রমণ করেন। ইখওয়ান সমস্ত পুলিশ ও ফাঁড়ির কার্যে নিয়োজিত মিস্ত্রিদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। একজন আহত পুলিশ এই সংবাদ ইরাকী কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন।(১১) এই ঘটনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে সউদকে বৃটেনের অনুগত মনে করে ফয়সল আদ-দুবেশ, সুলতান ইবনে হুমায়েদ, জায়দান ইবনে হিসলায়েন ও ইখওয়ানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইবনে সউদের অনুগত থাকেন না। ইখওয়ান নিজেরাই একটি শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। চারণ কার্যে নিয়োজিত নিরীহ গোত্রগুলিকে তারা নির্বিচারে আক্রমণ করে লুন্ঠন ও হত্যাকান্ড চালাতে থাকে। বৃটিশ শক্তি নজদ এলাকায় বোমাবাজির মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ করে।

বৃটিশ কর্মচারী গ্লাবের নেতৃত্বে একটি ছোট বিমান বাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু এই বাহিনী তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কুয়েতের অভ্যন্তরেও আক্রমণ পরিচালিত হয়। ইবনে সউদের জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যাদের সাহায্যে তাঁর রাজ্য লাভ সম্ভব হয়েছে তাদের গোঁড়ামী সমর্থন করলে তার রাজ্যের আধুনিকীকরণ বিপন্ন হবে। অপরদিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইবনে সউদ সরকারের সঙ্গে তার বর্তমান নীতি পরিবর্তন করবে। এসব কারণে ইখওয়ানের বিদ্রোহ আসন্ন হয়ে উঠে।। ১৯২৮ সালে মার্চ মাসে ইবনে হুমায়েদ এর নেতৃত্বে ইখওয়ান ইরাকের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান চালান। এই অভিযানে ইবনে হুমায়েদ এর সাহসিকতায় আদ-দুবেশকে ও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসে ইবনে সউদ ইখওয়ানকে কিছু

Dhaka University Institutional Repository

দিনের জন্য আক্রমণ বন্ধ রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। মে মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইরাকের সীমান্তে বুসাইয়া ফাঁড়ি বা দূর্গ সম্পর্কে ইবনে সউদ ইখওয়ানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অনুরূপভাবে আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত জেদ্দা সম্মেলনে দ্বিতীয় দফা সমঝোতা স্থাপনের ক্ষেত্রেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ইবনে সউদ ১৯২৮ সালের ৫ই নভেম্বর রিয়াদে নজদের সর্বস্তরের জনগণের এক সম্মেলন ডাকলেন।(১২) এতে পল্লী অঞ্চলের লোক, ওলামা, গোত্র নেতা হুজরার অধিবাসী সহ সর্বস্তরের লোক সমবেত হন।

গ্লাবের বর্ণনা অনুসারে ১২০০০-১৬০০০ লোক সম্মেলনে সমবেত হয়। উক্ত সম্মেলনে আলেমগণ ইবনে সউদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইখওয়ান নেতা আদ-দুবেশ এবং ইবনে বিজাদের বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। ফাঁড়ি নির্মাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয় যে, শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসন সম্ভব না হলে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হবে।(১৩)

ইবনে হুমায়েদ, আদ-দুবেশ এবং উজমানের ইবনে হিসলায়েম উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেনি। তবে আদ-দুবেশ তার পুত্র আব্দুল আজিজকে সম্মেলনে পাঠান।

ইবনে সউদ পরিস্থিতি অনুধাবন করে ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। উক্ত সম্মেলন বরং বিদ্রোহী নেতৃবর্গ ইবনে হুমায়েদ, আদ-দুবেশ এবং ইবেন হিসলায়েনকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর এই তিন নেতা ইবনে সউদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল যে, আদ-দুবেশ নজদের, ইবনে হুমায়েদ হেজাজের, ইবনে হেসলায়েন হাসা অঞ্চলের এবং শাম্মার গোত্রের জনৈক সরদার আল-হাইল অঞ্চলের এবং আর-রুওয়ালার একজন নেতা জওফের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।(১৪)

১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে নজদের পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠে। এ সময় সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া গুজব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তোলে। ইবনে সউদের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। ইরাকী ফাঁড়ির উপর ইখওয়ানের উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ইবনে সউদ জুবায়েল, কাতিফ ও অন্যান্য শহরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। অপর দিকে উতায়বা গোত্রের দুই প্রতিদ্বন্দ্বি শেখ ইবনে হুমায়েদ ও ইবনে রুবাইয়ানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে সম্পর্কে অবনতি হয়। ইবনে সউদ এই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করেন।(১৫) রিয়াদে ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অধিকাংশ ইখওয়ান, ওলামা, শীর্ষস্থানীয় সুধীজন এবং তিনজন নেতা ইবনে সউদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ ছিল। ইত্যবসরে ফয়সল আদ-দুবেশ ইবনে সউদের পুত্র সউদের নিকট এক প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করেন, আমরা মুসলমান হয়ে অমুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিনা কিংবা আমরা আরব এবং বেদুঈন একে অন্যকে আক্রমণ করে যা পাচ্ছি তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিনা। আপনি আপনাদেরকে আমাদের ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় তৎপরতা থেকেই দূরে রেখেছেন । আপনি আমার এবং আমার লোকদের জন্য যা করতে পারতেন তা করতে ব্যর্থ হন। আমার গোত্রের লোকজন কোথায় যাবে? তারাধ্বংস হয়ে যাবে। এতে আপনি কি করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। পূর্বে আমরা কেউ অন্যায় করলে ক্ষমা করতেন। কিন্তু এখন আপনি আমাদের জন্য তরবারী ব্যবহার করেন এবং খৃষ্টানদের দলে চলে যান। তাদের ধর্ম এবং দুর্গ আপনার দ্রুত ধ্বংসের জন্যই নির্মিত।(১৬) ইবনে সউদ বিদ্রোহী নেতাদের বিশেষ করে ইবনে বিজাদ ও আদ-দুবেশের সাথে তার মত পার্থক্য নিরসনে বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বিদ্রোহী তিনজন নেতার মধ্যে মতৈক্য ছিল না। তারা শুধুমাত্র ইবনে সউদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ছিল। ইবনে বিজাদ আধুনিকায়নের পক্ষপাতী এবং খৃষ্টানদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন।(১৭) ফয়সল আদ-দুবেশ রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন যদিও তিনি খাঁটি মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত থাকার দাবী করেন।(১৮) দাঁদান ইবনে হিসলায়েন ও তার ওজমান গোত্র কখনও ইবনে সউদের সাথে সমঝোতা চায়নি। পর পর দু'টি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এরা ইবনে সউদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। এছাড়া অন্যসব গোত্র ইবনে সউদের অনুগত ছিল। তাঁরা ইবনে সউদের সাথে কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারেননি। ইত্যবসরে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ান আক্রমণ শুধু অব্যাহতই ছিলনা বরং গতিবৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে। একটি উট ব্যবসায়ী মিশরগামী কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। উক্ত কাফেলার ব্যবসায়ীগণ ইবনে সউদের অনুগত প্রজা ছিল। ইখওয়ান দাবী করে এই কাফেলা আক্রমণের সময় যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তারা অবিশ্বাসী ছিল।

উক্ত রক্তক্ষয়ী ঘটনা নজদের শহর সমূহে ইবনে সউদের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। যে সকল গোত্র উক্ত ঘটনায় ইখওয়ান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা শহরবাসীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে ইবনে বেজাদ ইরাকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দেয়। উক্ত ঘোষণা ইবনে সউদ ও রিয়াদ সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদের প্রতি অনাস্থার শামিল ছিল।

ইবনে বিজাদ তার অনুগামীদের নিয়ে মুনতাফিক নামক উট পালকদের উপর আক্রমণ চালায়। আদ-দুবেশের মুতায়র গোত্রের ইখওয়ান এবং হিসলায়েনের উজমান গোত্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন।(১৯) পরিস্থিতি ক্রমান্বয়েই অবনতি হয় এবং ইবনে সউদের নীরব ভূমিকাকে নজদবাসীগণ তাঁর দুর্বলতা বলে মনে করেন।

উক্ত ঘটনা সমূহ ইবনে সউদকে ইখওয়ানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। ইবনে সউদ তাঁর বাহিনী নিয়ে কাসিম অঞ্চলে যান। সেখানে শহরবাসী এবং মরুদ্যানবাসী বিশেষ করে যারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল তাদেরকে তাঁর সেনাবাহিনীতে সংযুক্ত করেন। এরা শুধুমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই নয় তাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও সউদী বাহিনীর সঙ্গে যায়। এই সমস্ত লোক সউদী বাহিনীর মূল শক্তিতে পরিণত হয়।

পথে ইখওয়ান ভয়ে ভীত এবং অতিষ্ট বহু লোক ইবনে সউদের দলে যোগদান করে। ইখওয়ানদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা ইবনে সউদের দলে ভীড় জমায়। জন গ্লাব এইসব অশ্বারোহী বেদুঈনদেরকে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় লন্ডনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশৃঙ্খল বাহিনীর সাথে তুলনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।(২০) এই সৈন্যদলে তার অনুগত মুতায়র গোত্র হোতয়েমের অংশ অধিকাংশ হারব নজদী শাম্মার আল জিলফী এবং আনাযা গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে। ইত্যবসরে ইবনে সউদ শেখ রুবাইয়ানের নেতৃত্বে উতায়বা গোত্রের সমর্থন লাভ করে। এই কুটনৈতিক বিজয় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়। যদি ইবনে রুবাইয়ান তার সহযোগী উতায়বা নেতা ইবনে বিজাদের সাথে যোগ দিত তবে সিবিলা যুদ্ধের ফলাফল ভিন্নতর হতো। এমনকি এই সৈন্য সমাবেশের সময়ও ইবনে সউদ ও তার বিদ্রোহীদের মধ্যে একটি মিমাংসা স্থাপনের জন্য প্রস্তাব আদান প্রদান হয়। সিবিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের রাত পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইবনে সউদ আরতাবিয়ার দিকে অগ্রসরমান ইবনে বিজাদ ও আদ-দুবেশের ইখওয়ান সৈন্যদলের মোকাবেলার জন্য পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। দিদান ইবেন হিসলায়েন ও তার অনুগত ওজমান গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক হাসায় লোক দেখানো বিদ্রোহ প্রদর্শন করে এবং প্রকাশ্য সমরাভিযানের চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। বিদ্রোহী ইখওয়ান বাহিনী এবং ইবনে সউদের অনুগত বাহিনী একে অপরের এক মাইল ব্যবধানে সমভূমিতে শিবির স্থাপন করে।

সিবিলা বলে আখ্যায়িত এই সমভূমি ইখওয়ানের রাজধানী আরতাবিয়া এবং পুরাতন শহর জিলফীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইবনে সউদের বাহিনী ও বিদ্রোহী ইখওয়ান দল স্ব স্ব শিবিরে মহড়ায় লিপ্ত ছিল। এই সময় তাদের যুদ্ধ না করার ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। ইবনে সউদ প্রথমে নজদের একজন প্রসিদ্ধ আলেম আব্দুল্লাহ আল-আনকারীকে ইখওয়ান শিবিরে পাঠান। তিনি বিদ্রোহী ইখওয়ানকে শরীয়া আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তাব দেন। এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এরপর ইবনে বিজাদ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর দলীয় প্রধান শেখ মজিদ ইবনে খাতিলাকে একখান পত্রসহ ইবনে সউদের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন লেখকরা মন্তব্য করেছেন যখন মজিদ ইবনে খাতিলা ইবনে সউদের তাঁবুতে প্রবেশ করেন তখন ইখওয়ানের প্রথা অনুযায়ী ইবনে সউদকে সালাম দেয় না। এমন কি ইবনে সউদের সালামের উত্তরও দেয়নি। কারণ ইখওয়ানের মতে তারা খাঁটি মুসলমান ছিল না।(২১) এই অসম্মানজনক আচরণে ইবনে সউদের ক্রোধের

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চার হয়। তিনি মজিদ ইবনে খাতিলাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আপনি ইবনে বিজাদকে বলে দিন যে তার সম্মুখে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করে শরীয়া আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া অথবা যুদ্ধের ময়দানে আমার মোকাবেলা করা' এভাবে সমঝোতার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ফয়সল আদ-দুবেশ চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে ইবনে সউদের তাঁবুতে অবস্থানের অনুমতি চান। ইবনে সউদের তাঁবুতে তার অবস্থানকে বন্দীদশা বলে অভিযোগ করে তার উদ্দেশ্যে ছিল ইখওয়ানকে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। জন গ্লাব বলেন যে(২২), আদ-দুবেশ ইবনে সউদের তাঁবুতে সত্যিই নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ইবনে বিজাদ আদ-দুবেশের পুত্র আব্দুল আজিজ তার পিতা যে বন্দী সে কথা বুঝাতে সক্ষম হন না। অন্য সূত্রে দাবী করা হয় যে, আদ-দুবেশ ইবনে সউদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ইখওয়ানের কাছে তার দাবীর জবাব ঐ রাত্রেই পাঠানো হবে। কিন্তু প্রত্যুত্তর যথাসময় পৌঁছায়নি।(২৩) অপর সূত্রে বলা হয় আদ-দুবেশ ইবনে সউদের আনুগত্যে স্বীকার করেননি। তিনি ইবনে বিজাদকে দলত্যাগের পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে অকৃতকার্য হলে তিনি নিজেই যেন নিরাপদে আরতাবিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।(২৪) গ্লাবের বর্ণনা মতে আদ-দুবেশের সউদী তাঁবুতে অবস্থান মোটেও তথ্য নির্ভর নয়।

সিবিলার যুদ্ধ সংঘটিত হয় পরবর্তী সকালে। এ ঘটনা সর্বজন স্বীকৃত যে, আদ-দুবেশ তখন বিদ্রোহী তাঁবুতে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে ওয়াহাবার মতই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইবনে সউদ আদ-দুবেশকে বলেছিলেন, 'আপনি নিজেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন, অথবা সমস্ত শাস্তিই বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপনার উপরও বর্তাবে।(২৫) আদ-দুবেশ সারা রাত ইবনে সউদের তাঁবুতে অবস্থান করেন ইখওয়ানের এই দাবীর সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আদ-দুবেশ অবশ্যই ঐ রাতে নিজ তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইবনে বিজাদ ও অন্যান্য নেতাদের সাথে মিলিত হন।

১৯২৯ সালের ৩০শে মার্চ ভোরে ইবনে সউদের বাহিনী ও বিদ্রোহী ইখওয়ান মুখোমুখী হয়।(২৬) ইখওয়ান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষের প্রায় এক

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়াংশ।(২৭) অবশ্য অতীতে সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্বেও হেজাজী গোত্রও শরীফ হোসাইনের বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে।

উম্ম-আল-কুরার বর্ণিত তথ্যানুসারে ইবনে সউদ সৈন্য বাহিনীকে কোমরে বেল্ট বেঁধে রাইফেল হাতে পাহাড়ে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। সৈন্যদের লাইন ছিল মাইলের ও বেশী দীর্ঘ। ইবনে সউদ সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থলে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সৈন্য পরিচালনায় তাঁর ভাই আমীর মুহাম্মদ অশ্বারোহী বাম দিকে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র আমীর সউদ সৈন্য নিয়ে তাঁর ডানে অবস্থান নেন। শত্রুপক্ষ আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করেন। উভয়পক্ষের পদাতিক বাহিনী প্রথমে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইবনে সউদের বাহিনী সম্মিলিতভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত এবং মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে তারা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেন। শত্রুদের মধ্যে যারা অস্ত্র ত্যাগ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক ঘন্টার মধ্যে শত্রুরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এরপর ইবনে সউদ সেনাবাহিনীকে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।(২৮)

যুদ্ধের পরদিন ইবনে বিজাদ ও ফয়সল আদ-দুবেশ ইবনে সউদের নিকট প্রতিনিধি মারফত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।(২৯) ইবনে সউদ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে না তবে শরীয়া আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ইবনে সউদ যুদ্ধাহত আদ-দুবেশকে রিয়াদে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের শর্তে রিয়াদ গমনের অনুমতি দেন। ইবনে সউদের সেনাবাহিনী ইবনে বিজাদের উপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে ইবনে সউদের তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেয়নি। অবশেষে তাকে রিয়াদ অথবা সাকরায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়।(৩০)

দীদান ইবনে হিসলায়েন সরাসরি বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে সেনাবাহিনী নিয়ে আল-হাসায় অবস্থান করেন। যুদ্ধ শেষে ইবনে সউদ শেখ আবদুল্লাহ আল আনকারী, শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহীম, শেখ আবু হাবিব শুরাতাঁসহ বিশিষ্ট আলেম, সেনাধ্যক্ষ ও গোত্রীয় নেতাদের সঙ্গে এক সমাবেশে মিলিত হন। এই সমাবেশে ২০০০ লোকের সমাগম হয়। তিনি তাঁর ভাষণে বিদ্রোহী ইখওয়ান সম্পর্কে বলেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. ধর্মীয় সিদ্ধান্ত অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহভিত্তিক হতে হবে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় নয়।

খ. তাদেরকে রাজতন্ত্রের অনুগত হতে হবে যা, শরীয়া দ্বারা পরিচালিত।

গ. রাজদরবারের অনুমতি ছাড়া তারা কোন জনসভা অথবা ধর্মসভা করতে পারবে না।

ঘ. অবশ্যই তারা মুসলমান ও মুসলমানদের অধীন যারা তাদের সবাইকে সম্মান প্রদর্শন করবে।(৩১)

এই যুদ্ধের পর পরাজিত সেনাগণ যাতে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে এই উদ্দেশ্যেই ইবনে সউদ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে ইখওয়ান সেনাগণ উপরোক্ত নীতি মালা লংঘন করেন। ইবনে সউদের হেজাজে অবস্থানকালীন একটি দুর্ঘটনায় উজমান গোত্র পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ, সম্মিলিত বেদুঈন এবং ইখওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়।

যুলকাদা ১৩৪৭/মে ১৯২৯ সালে আল-হাসায় নিযুক্ত ইবনে সউদের গভর্ণর আব্দুল্লাহ ইবনে জুলবীর পুত্র ফাহাদের আদেশে দীদান ইবনে হিসলায়েনকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উজমান অঞ্চলের ইখওয়ান সদস্য কর্তৃক ফাহাদ ও নিহত হন।(৩২) দীদানের পিতৃব্য ভ্রাতা নাইফ আবুল কিলাব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনে সউদ হেজাজে অবস্থানকালে দীদানের মৃত্যু সংবাদ পান।

আদ-দুবেশ রিয়াদে আত্মসমর্পন না করে পালিয়ে যান। তাঁকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর ইবনে সউদ তাঁর সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেন। একই সঙে তিনি প্রশাসন ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন।

ইবনে সউদ ভাবলেন বৃটেনের সমর্থন ছাড়া ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব। তাই তিনি হেজাজ ত্যাগের পূর্বে এই মর্মে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি পেলেন যে, জর্দান, কুয়েত এবং ইরাক ইখওয়ানের কোন সাহায্য করবেনা। আরও প্রতিশ্রুতি পেলেন বৃটেনের অধীন বিদ্রোহী ইখওয়ান অন্য দেশের পবিত্র স্থান

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন শেষে প্রত্যাবর্তন না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

জর্দান, হাশেমীয় রাষ্ট্র ইরাক, কুয়েতের সাবা পরিবার ফয়সল আদ-দুবেশকে সমর্থন দেন। তারা দুবেশকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিতব্য ট্রান্সজর্দান রাষ্ট্রের আমীর বানানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু বৃটেন এই পরিকল্পনা সমর্থন না করায় উক্ত পরিকল্পনা সফল হয়নি।(৩৩) ফয়সল আদ-দুবেশ সুস্থ হয়ে ১৩৪৮, মুহাররাম/১৯২৯ জুন মাসে পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহী নেতা নাইফের সাথে যোগ দেন।

ইবনে সউদ নজদ থেকে ফিরে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি শুরু করেন। উক্ত বাহিনীকে সজ্জিত করা জন্য কমপক্ষে ৩০০০ লী ইন ফিল্ড (Lee Enfield) রাইফেল এক হাজার বাক্স গোলাবারুদ প্রেরণের জন্য বৃটেনকে অনুরোধ জানান। জেদ্দা ওকায়ের সড়ক পথ পাহারার জন্য এক হাজার টৌকস যোদ্ধার সেনাবহনকারী গাড়ী প্রেরণের অনুরোধ জানান।(৩৪)

ইবনে সউদ তার অনুগত উতায়বা গোত্রের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য গোত্রীয় নেতাদেরকে আল-দাওয়াদেমী শহরে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে অনুরোধ জানিয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রিয়াদ ত্যাগ করেন। ১৯২৯ সালের ৯ই জুলাই তিনি দাওয়াদেমী উপস্থিত হন।

উতায়বা গোত্রের নেতৃবৃন্দ আল রুওয়াকার শেখ ওমর ইবনে আব্দ-আল রহমান ইবনে রুবাইয়ায়ান, জিহজাহ বিজাদ ইবনে হুমায়েদ, ইবনে বিজাদের ভাই (যিনি সিবিলা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কারাগারে ছিলেন) সম্মেলনে যোগ দেন। এছাড়া দাজিন গোত্র নেতা মানাহি আল-হাদহাল, আল-আসমা নেতা সুলতান আবা-আল' আলা, আর-রুসান গোত্র নেতা খালিদ ইবনে জামী সহ প্রায় ২০০০ লোক উক্ত সম্মেলনে সমবেত হন।(৩৫) উক্ত সভায় ইবনে সউদ ওজমান গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করলে নজদ ও হেজাজের উতায়বা গোত্রের সমর্থনে তাদেরকে পরাভূত করারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতা দান কালে ওজমান গোত্রের লোকদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ক. যারা ধর্মে অবিচল ও তাঁর অনুগত।

খ. স্বার্থপর।

গ. স্বল্প সংখ্যক যারা বিদ্রোহ করেনি।

সিবিলা যুদ্ধ শেষে তিনি দু'টি সমস্যার সম্মুখীন হনঃ-

প্রথমতঃ নজদে অবস্থান ও বিদ্রোহ দমন।

দ্বিতীয়তঃ হজ্জ্ব পালন না করা (যা একজন ইমামের জন্য আদৌ সমীচিন নহে)। অথবা হেজাজে প্রত্যাবর্তন শেষ পর্যন্ত তিনি হজ্জ্ব পালনেরই সিদ্ধান্ত নেন।(৩৬)

সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত বিদ্রোহীগণকে নিম্নের শর্তে ইবনে সঊদ ক্ষমা করবেনঃ-

ক. চিন্তায় বা কার্যে যদি কেউ অপরাধি হয় এবং উক্ত অপরাধ স্বীকার করে তাঁকে ক্ষমা এবং পুনর্বাসিত করা হবে। অপরাধ স্বীকার না করলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার বিচার করা হবে।

খ. যে সকল বিদ্রোহী রাহাজানী ও পথিকদের হয়রানী এবং রাস্তার ক্ষতি সাধনে লিপ্ত তাদের শাস্তি দানের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে।

গ. জেহাদ ঘোষণা করা হলে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কেহই অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারবে না। কোন মুসলমান যদি জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে রাজী না হয়। জেহাদ শুরু হবার পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।(৩৭)

দাওয়াদেমী সম্মেলন শেষে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, ওতায়বা গোত্রের বিদ্রোহ দমনে তিনি সফল হয়েছেন। তাই তিনি রিয়াদ অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু উক্ত ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। ওতায়বা গোত্রের বিদ্রোহীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সংকট সৃষ্টি করে। ইবনে সঊদ মক্কা এবং রিয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে আরেকটি সম্মেলন ডাকেন। ১৯২৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

ওতায়বা গোত্রের অনুগত লোকদের এবং অন্যান্য গোত্র প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে সউদ প্রশ্ন করলেন ওতায়বা গোত্র তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের পর কিভাবে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের করণীয় কি তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাদেরকে গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরের দিন শায়রায় উপস্থিত হতে বলেন। শায়রায় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ প্রত্যুষে ৪ ঘন্টা আলোচনার পর নিম্ন সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।(৩৮)

১। ভিন্নমতাবলম্বী ওতায়বা এবং মোতায়র গোত্রের বনী আবদুল্লাহর শাখার সকলকে পরাভূত করা হবে। ভবিষ্যতে যেন তাদের বে-আইনী কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকে।

২। জীবিত বিদ্রোহীদের সমরাস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। তাদেরকে শরীয়া আদালতে বিচারে সম্মুখীন হতে হবে।

৩। ইবনে সউদের পক্ষে যারা যুদ্ধ করেনি এবং বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন করেছে তাদের উট ঘোড়া এবং রাইফেল কেড়ে নেওয়া হবে।

৪। যোদ্ধাগণ বিদ্রোহীদের থেকে যে সব সম্পদ পেয়েছেন ইমাম ইবনে সউদের অনুমতিক্রমে নিজেদেরকে শক্তিশালী করার জন্য তা তাদের কাছে রাখতে পারবেন।

৫। সাকরায় কিছু দুর্নীতিবাজ লোক বাস করতো। তাদের শরীয় ও জনকল্যাণ সম্পর্কিত কার্যাবলী পর্যালোচনার জন্য একজন আমীরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠানো হবে।

৬। দুর্নীতিগ্রস্ত হিজরা সমূহ থেকে সেনাবাহিনী স্থানান্তরিত করা হবে। হিজরাবাসীদেরকে বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে বসবাস করতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হবে না।

৭। ইবনে সউদের শায়রায় অবস্থানকালেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। সেজন্য সেখানে একটি বাহিনী ও প্রেরণ করা হবে। তবে অনূর্ধ দশ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। উপরোক্ত রায় কার্যকর করার পর বিদ্রোহী ওজমান গোত্র ও আদ-দুবেশ যে সীমান্তে সমবেত হয়েছে, ইবনে সউদের সকল বাহিনী সেখানে মিলিত হবেন। ইবনে সউদ শায়রা গমনের প্রাক্কালে শহর এবং হুজরার সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে আদেশ দেন। একই সঙ্গে তাঁর প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাদেরকে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অগ্রসর হবার নির্দেশ দিবেন। তিনি ধারণা করেন যে, ১৯২৯ সালে নভেম্বরের মধ্যে অভিযান চালানো যেতে পারে।

১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর তিনি ৩০ টি বিশেষ গাড়ীর বহরে কয়েকজন শিশু, যুবরাজগণ, রাজকর্মচারী ও দেহরক্ষীদের নিয়ে আল-খাফসের উদ্দেশ্যে রিয়াদ ত্যাগ করেন।(৩৯) রিয়াদ থেকে উক্ত স্থানে দূরত্ব ১১৫ কি. মি.। সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মোহাম্মদ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। ইবনে সউদ ও তাঁর সহযাত্রী সেখানে রাত্রি যাপন করেন। তাঁরা খাফস থেকে ৮০ কি.মি. দূর আল-সাওয়াকী নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে ফয়সল আদ-দুবেশ, আল-হুমায়দী ইবনে মিফলাহ এর নেতৃত্বে তাকে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এছাড়াও প্রতিনিধিদলের নেতা মিফলাহকে একখানা পত্র সহ পাঠান। উক্ত পত্রে আদ-দুবেশ তার পুত্র আবদ আল আযীযকে হাইলের আমীর ইবনে মুসায়েদ 'উম-উরদ' যুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করেন।(৪০)

ইবনে সউদ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। একদিন পর আদ-দুবেশকে তাঁর সহানুভূতিসূচক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দেন।

১। ইতিপূর্বে আপনার সম্মুখে সকল পথ বন্ধ হয়। তখন আপনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন। আমি আপনার দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ এবং অপছন্দও করেছি। এখন আমার কাছে ছুটে আসা ছাড়া আপনার বিকল্প কোন পথ নেই।

২। আপনি একজন ধুরন্ধর। ক্ষমাপ্রাপ্তির পর জনগণকে বলবেন যে, আপনি যা চান তাই করেন। এরপর ইবনে সউদের নিকট গিয়ে তার কাছে যা চাওয়ার তা আদায় করে নিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। আমার সঙ্গে আপনার পুনর্মৈত্রী স্থাপনের কথা বলে তাদের মন জয়ের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা আপনাকে সাহায্য করেনি।

৪। আপনি মুসলমানদেরকে ক্ষিপ্ত করেছেন। এই কারণে তারা একে অন্যকে হত্যা করেছে এবং তাদেরই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

৫। আপনার পত্র এবং প্রতিনিধি না পাঠানোই ভাল ছিল। আপনি ও আপনার সহচরবৃন্দ সহ আমার জিম্মায় আছেন। আপনাদেরকে হত্যা করা হবে না।(৩৯)

প্রত্যুত্তরে আদ-দুবেশ ইবনে সউদের নিম্নবর্ণিত পত্রটি প্রেরণ করেন, 'পত্র প্রেরণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনাকে জানাতে চাচ্ছি যে, আমার সম্মুখে সমস্ত পথ বন্ধ আপনার এ ধারণা ঠিক নয়। অনেক শক্তিশালী সরকার সেদেশের নাগরিকত্ব দানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইচ্ছা করলে আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু ধর্মীয় কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ ঐসব দেশের শাসনব্যবস্থা নাস্তিকতাপূর্ণ। মুসলমানদের ইমাম যে কোন ব্যাপারে অন্যের চেয়ে উত্তম বিধায় আপনার নিকট ফিরে এসেছি।'(৪০) আদ-দুবেশ অঙ্গীকার করেছিল যে, ইবনে সউদের প্রতি আনুগত্য ও একাগ্রতা প্রকাশের জন্য শীঘ্রই তাঁর রাজদরবারে যাবেন। যেহেতু আদ-দুবেশ তাঁর কাছে আসবেন যে জন্য ইবনে সউদ পত্রের উত্তর দেননি। ইবনে সউদ ও তার মধ্যে পত্র যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সমঝোতার সকল পথ বন্ধ হওয়ার পর আদ-দুবেশ তাঁর দরবারে আসেন।

ইখওয়ানের সাথে ইবনে সউদের সমঝোতায় আসার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পরিস্থিতির অবনতি হয়। ওজমান গোত্রের ফারহান ইবনে মাশহুর আওয়াযীম গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। এদিকে বিদ্রোহ দমনে ইবনে সউদ সামরিক বাহিনী নিয়ে হাসার দিকে অগ্রসর হন। ইখওয়ান তাদের পরিবারবর্গ নিরাপদ স্থান কুয়েতে পাঠিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বৃটেন বিদ্রোহী ইখওয়ানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেন। দুবেশ কুয়েতের আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করেন। নজদের পশ্চিমাঞ্চলে ওতায়বা গোত্র ইবনে সউদের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ইবনে সউদ কুয়েত সীমান্তে ত্রিমুখী আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

চালান। বৃটেন কুয়েতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের উপর বিমান হামলা চালায়। ফলে বিদ্রোহী ইখওয়ান কোণঠাসা হয়ে পড়ে। যারা চায় তাদেরকে আদ-দুবেশ আত্মসমর্পণের অনুমতি দেন। অনেক বিদ্রোহী ইখওয়ান এই সুযোগ গ্রহণ করেন। দুবেশের সম্মুখে দু'টি পথ খোলা ছিল: যুদ্ধ করা অথবা পালিয়ে যাওয়া।

১৯২৯ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে বৃটেন অবশিষ্ট ইখওয়ানকে কুয়েত ত্যাগের নির্দেশ দেন। প্রতিদিন অনেক বিদ্রোহী ইবনে সউদের তাঁবুতে আত্মসমর্পণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে। খাদ্য ঘাটতি ও পানির অভাব দেখা দেয়। চারণভূমিও পানির অভাবে বহু উট মারা যায়। বৃটিশ বিমান প্রহরায় আক্রমণরত সউদী বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করে অনেকেই ব্যর্থ হয়। সম্মিলিত আক্রমণ বিদ্রোহী ইখওয়ানকে ইরাক বা জর্দানে পলায়নে বাধা দেয়।

১৯৩০ সালের ৯ই জানুয়ারী নাঈফ ইবনে আল-হিসলায়েন বৃটিশ রয়েল বিমান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।(৪১) ১০ই জানুয়ারী প্রখ্যাত বিদ্রোহী নেতা ফয়সল আদ-দুবেশ এবং সাহুদ ইবনে লামীও আত্মসমর্পণ করেন। এই তিনজন বিদ্রোহী নেতাকে বিমান যোগে বসরায় পাঠানো হয়।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৩০ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার হিউ বিসকোকে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন এয়ার ভাইস মার্শাল বার্নেট ও ডিক্সন সহ ইবনে সউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ইবনে সউদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিবেন। যে সব বিদ্রোহী বর্তমানে বৃটিশের কাছে বন্দী রয়েছে তাদের সম্পর্কে স্যার হিউ বিসকো নিম্নোক্ত নির্দেশ দেনঃ-

১। বিদ্রোহী ইখওয়ান নেতা এবং তাদের আত্মীয় স্বজনের প্রাণ রক্ষা করা হবে।

২। শাস্তি অতিরিক্ত অথবা আরবের নির্মম আচরণের মত অথবা ইংরেজদের প্রচলিত হত্যাযজ্ঞের অনুরূপ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ভবিষ্যতে ইরাক বা কুয়েত ইখওয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা নিরসণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আত্মসমর্পণের এই শর্তবলী হিউ বিসকো এবং ইবনে সউদ স্বাক্ষর করেন। পরে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দকে ইবনে সউদের নিকট উপস্থিত করা হয়।(৪৩)

উক্ত শর্তসমূহ পেশ করার পূর্বে বৃটেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার হিউ বিসকোকে ইবনে সউদের সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দেন। নিত যেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্রোহী ইখওয়ান নেতাদের সাইপ্রাস অথবা অন্য কোন দেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করার সম্মতি দেন। আদ-দুবেশ, আল-হেসলায়েন এবং ইবনে লামীকে বসরায় স্থানান্তরিত করা হয়। অবশিষ্ট ওজমান ও মুতায়ের গোত্রের বিদ্রোহীগণকে কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ১৫ মাইল দূরে সফওয়ান নামক স্থানে সমবেত করা হয়। ইবনে সউদের নিকট বিদ্রোহীদেরকে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত আর.এ.এফ. এর পাহারায় সেখানে অবস্থান করে। স্যার হিউ বিসকো বিমান যোগে তিনজন বিদ্রোহী নেতাকে কুয়েত থেকে ইবনে সউদের নিকট নিয়ে যান।

স্যার বিসকো ও ইবনে সউদ বিদ্রোহী ইখওয়ানের আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। পর্যালোচনা শেষে নিম্নোক্ত কারণে ইবনে সউদ বিদ্রোহীদেরকে নির্বাসন দিলেন নাঃ-

১। ভবিষ্যতে কোন বিদ্রোহ হলে বৃটিশ ইবনে সউদকে অস্ত্র গোলাবারুদ, বিমান ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন।

২। বিদ্রোহী গোত্রগুলি যাতে পুনরায় বিদ্রোহের সুযোগ না পায় তার জন্য বৃটেন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। বিদ্রোহীরা যাতে কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৃটেন সাহায্য করবে।

৪। বিদ্রোহীদের জীবন রক্ষার জন ইবনে সউদ বৃটেনকে লিখিতভাবে নিম্নোক্ত নিশ্চয়তা প্রদান করেনঃ-

(১) তিনজন বিদ্রোহী নেতা ফয়সল আদ-দুবেশ, নাঈফ ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

হিসলায়েন, জাসীর ইবনে লামী এবং তাদের অনুসারীরা অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের অনুরোধে বিদ্রোহী নেতা ও তাদের গোত্রের লোকদের জীবন রক্ষা করা হবে।

(২) ভবিষ্যতে বিদ্রোহীরা যাতে এরূপ অপরাধ করতে না পারে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারেও বৃটেন সাহায্য করবে।

(৩) ন্যায়বিচার ও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে অপরাধের বিচার করা হবে। তবে অন্যদের নিকট থেকে বিদ্রোহীরা যে সম্পত্তি দখল করেছে তা ফেরৎ দিতে হবে।

(৪) প্রতিবেশী সরকারের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইরাকীদের নিকট হতে ইতিপূর্বে যে সম্পত্তি দখল করা হয়েছে তা বাহরা চুক্তি অনুযায়ী দখলকৃত সম্পত্তির মীমাংসা করা হবে।(৪৫)

তিনজন বিদ্রোহী নেতা ও তাদের অনুসারীদের অশুভ কার্যকলাপের নিম্নরূপ শাস্তি দেওয়া হয়ঃ-

১। ফয়সল আদ-দুবেশের প্রসিদ্ধ শুরফ (SHURF) সহ সমস্ত উট ও ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়।

২। দুশান বংশের মোতায়র গোত্রের উটের অর্ধেক এবং সব ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৩। মোতায়র গোত্রের সাধারণ ইখওয়ানের সওয়ারীসহ সমস্ত উটের দুই তৃতীয়াংশ এবং সব ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৪। উজামান গোত্রের অনুরূপ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তাদের ক্ষেত্রেও মোতায়র গোত্রের চেয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।(৪৬)

গ্লাবের বর্ণনানুসারে শুরফ উটের সংখ্যা ছিল ১২০টি। তার থেকে একশত উট ইবনে সউদের পুত্র মুহাম্মদকে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ২০টি উট দুশান গোত্রকে দেওয়া হয়।(৪৭) আদ-দুবেশ, নাঈফ আল-হিসলায়েন এবং শাহুদ ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

দামীকে প্রাণদন্ড না দিয়ে রিয়াদে যাবজ্জীবন করাদন্ড দেওয়া হয়। তাদেরকে হুফুফ কারাগারে রাখা হয়।

ইবনে সউদের বিরুদ্ধে ইখওয়ানের অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ডিকসন নিম্নোক্ত কারণ সমূহ অথবা এর যে কোন একটি নির্দেশ করেছেনঃ

১. এটা সার্বজনীনভাবে অনুভূত হয় যে, ইবনে সউদ তাঁর ইখওয়ান বাহিনীর দ্বারা সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করেন নি। অন্যদিকে যেভাবে ইখওয়ানের পাশে তাঁর দাঁড়ানো উচিৎ ছিল তাও তিনি করেন নি। তিনি যে অবস্থানে উন্নীত হয়েছেন বস্তুতঃ তা ছিল ইখওয়ানেরই অবদান এবং তারাও খাঁটি মুসলমানই ছিল।

২. ইবনে সউদ বৃটিশকে তাঁর সাহায্যের জন্য ডেকে আনেন এবং তাদের সহায়তায় তাঁর নিজের মুসলিম প্রজাদের বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন।

৩. তিনি আরবের তিনজন গোত্রপতি ফয়সল আদ-দুবেশ, নাঈফ-আল-হেসলায়েন ও সুলতান ইবনে হুমায়েদ আল-উতায়ীর সঙ্গে নিষ্ঠুর এবং অহেতুক নৃশংস আচরণ করেন। যখন তাদের সঙ্গে মর্যাদাময় ব্যবহার করা যেত।(৪৮)

বিদ্রোহের অবসান হলো। ইবনে সউদ তাঁর নতুন রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য শত্রুকে তিনি ক্ষমা করে দেন। অল্প সংখ্যক যারা তাঁর অনুগ্রহের সুযোগ নিতে ব্যর্থ হন তাদেরকে লঘু শাস্তি দেন। ফয়সল আল সিবলান ইবনে সউদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সিবলানকে ক্ষমা করে দেন। পরে তাঁকে রাষ্ট্রীয় উটের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়।(৪৯)

মজিদ ইবনে খাতিলা যিনি ইবনে বিজাদের পত্র ইবনে সউদ সউদের নিকট সিবিলায় হস্তান্তর করে তাঁকে কয়েক সপ্তাহ দুর্মায় কারারুদ্ধ রাখা হয়।(৫০) তারপর তাঁকেও একটি সরকারী দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হয়। বিদ্রোহের পর দুবেশ পরিবারের লোকদের আরতাবিয়ায় পুনর্বাসিত করা হয় এবং সেখানে তারা শাসনকার্যেও অংশ গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট ইখওয়ানকে ন্যাশনাল

Dhaka University Institutional Repository

গার্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ইখওয়ানের বিদ্রোহ দমনের পর ইবনে সউদের রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইবনে সউদের বিরুদ্ধে আর কোন উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হয়নি। তিনি সারাদেশে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদ্রোহীদেরকে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ দিয়ে তাঁর রাজ্যে পুনর্বাসিত করেন। (৫১)

বৃটেন মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে সউদী আরবের ব্যাপারে ত্রিমুখী নীতি গ্রহণ করে। নজদের রশিদী রাজ পরিবার ও ইবনে সউদের মধ্যে ক্ষমতা দ্বন্দ্বে উভয়কে আর্থিক ও কৌশলগত সমর্থন জানায়। ইবনে সউদ রশিদী রাজ পরিবারকে নজদ থেকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। মক্কার শরীফ হোসাইন হেজাজের শাসক ছিলেন। শরীফ হোসাইনও ইবনে সউদ এই দু'জনে মধ্যে কাকে বা কোন বংশকে আরব উপদ্বীপের ভবিষ্যত শাসক বলে গ্রহণ করা যায় এই প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মতদ্বৈত ছিল। আরব ব্যুরো হাশেমী বংশের শরীফ হোসাইনকে সমর্থন করেন। অপরদিকে ভারত সচিবের দপ্তর আব্দুল আজিজ ইবনে সউদকে ভবিষ্যত আরবের নেতা বলে মনে করেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই বিভাগ হতে আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। শরীফ হোসাইন আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টা করেননি। তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য বৃটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।

পক্ষান্তরে ইবনে সউদ বৃটিশের সাহায্য গ্রহণ করে নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে ইখওয়ান নামে একটি সংগঠন সৃস্টি করেন। ইখওয়ান ছিল ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। এই ইখওয়ান বাহিনীর সহয়তায়ই তিনি অতি দ্রুত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ইখওয়ান বাহিনী ইবনে সউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন বৃটেন বিদ্রোহীদের ইন্ধন যোগায়। বৃটেন যখন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলো যে, ইবনে সউদ ইখওয়ানের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম তখন বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেন।

ইবনে সউদ ইখওয়ান বিদ্রোহ দমনে বৃটেনের সাহায্যের আবেদন জানান। বৃটেন ইবনে সউদের আবেদনে সাড়া দেয়। এভাবে ইবনে সউদ বৃটেনের

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগীতায় ইখওয়ান বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন।

ইখওয়ান বিদ্রোহের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ সংঘর্ষের জন্য ইবনে সউদ বা ইখওয়ান নেতাদের যাকেই দায়ী করা হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাম্বলী ওয়াহাবী মতবাদকে আধুনিক দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা? এ সংঘর্ষ সেই প্রশ্নেরই উত্তর স্বরূপ। শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত রাজা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ মনে করেছিলেন যে বাস্তব প্রয়োজনে কঠোর ওয়াহাবী নীতির রদ-বদলের প্রয়োজন রয়েছে। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ এই বাস্তব প্রয়োজনকে স্বীকার করেনি। এটাই সংঘর্ষের মূল কারণ।(৫২)

তবে সংঘর্ষের শেষের দিকে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দও বোধ হয় নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ ইখওয়ান মৌলনীতি অনুযায়ী যে বিধর্মীদের দেখামাত্র হত্যা করার কথা, সেই বিধর্মী বৃটিশের নিকটই তারা আত্মসমর্পণ করেন। তেল সম্পদে সমৃদ্ধশালী হবার পর কেবল শহরগুলিতে নয় বেদুইন গোত্রদের মধ্যে আধুনিকীকরণের প্রয়াস দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. Mohammad Almana, Arabia Unified, London, 1980, P. 86.

২. H.R.P. Dickson, Kuwait and her Neighbour, London, P. 281.

৩. Jhon S. Habib, Ibn Saud's Warriors of Islam, Netherlands, 1978, P. 119.

৪. Sheik Hafiz Wahbah, Arabian days, London, 1960, P. 133.

৫. H.C. Armstrong, Lord of Arabia, London, 1934, P. 157.

৬. John Bagot Glubb, The Story of the Arab Region, London, 1948, P. 128.

৭. Majmuat Al-Muahadat Min Am 1341-1350, 1922-1931, Saudi Arabian Ministry of Foreign Affairs, PP. 6-7.

৮. Glubb, War in the Desert, London, 1977, PP. 193-195, This work gives an excellent and detailed account of the Ikhwan raids against Iraq.

৯. Hafiz Wahbah, Jazirat-el Arab, Egypt, 1387, A.H.P. 289.

১০. Umm Al-Qura, No. 126, 10 May 1927. It was attended by Faysal al-Dawish, Ibn Bijad and all Sheikhs of the Mutayar, Utaybah, Qahtan, Shammar, Harb, Ujman, Murra, Auazah of Najd, Dawasir, Suleay, Suhul, Bani Hajir.

১১. Dickson, Ibid, P. 287.

১২. Umm Al-Qura, number 208, 18 December 1928.

১৩. Glubb Report.

১৪. Halib, Ibid., P. 128.

১৫. Dickson, Ibid., P. 300.

১৬. English translation of a letter from Faisal Bin Sultan Ed Doweish to Amir Saud, Public Record office MSS FO 371-13736, Document No. E 3457.

১৭. This is the opinion expressed by some Ikhwan, like Majid Ibn Khatila, and

Dhaka University Institutional Repository

some members of the Saudi Royal Family, such as, Abd-al Rahman Ibn Abdullah. Interviews, Riyadh, 1969, John S. Habib.

১৮. His threat to flee to Iraq is proof of this, not to say his actual attempts to seek political asylum in the every countries which he described as enemies of Islam.

১৯. Mr. Henry Bilkert, an American missionary in Basra who was riding in a car with Mr. Charles R. Crane, was killed when part of the Ujman raiding party shot at the car in which they were riding. See Dickson, Kuwait, P. 300.

২০. Glubb Report from Busaiyah, Habib, P. 138.

২১. When I asked Majid Ibn Khatbila about this matter, at first he was equivocal; when I pressed for an answer, he stated that he did give the Islamic greeting to Ibn Saud when he entered the tent.

২২. Glubb, war in the Desert, P. 286.

২৩. Umma al-Qura, number 224, 12 April 1929.

২৪. Glubb, war in the Desert, P. 286.

২৫. আহমদ আব্দুল গফফুর আত্তার, ছকরুল জাযীরা, জেদ্দা, ১৯৬৪, পৃঃ ৪১।
Waebae and Saqr both report this, and add that Ibn Saud told a`-Dawish to return to his own camp and spend the night there, because he has expected al-Dawish's attempt to set a trap Lazirat, P. 304.

২৬. Dickson, Kuwait, P. 303, claims that Ibn Saud made a morning surprise attack while the Ikhwan were still under the impression that negotiations were going on. None of the Ikhwan whom this writer interviewed made this accusation; they described it, instead such as was reported in Ummal-Qura, number 24, 12 April 1929.

২৭. Attar, Saqr, estimates that Ibn Sauds army numbered 28,000 including 8,000

Dhaka University Institutional Repository

townsmen and 20,000 Ikhwan and Bedouin. the Ikhwain's estimate vary, but all agree that they were significantly outnumbered.

২৮.Umm al Qura, number 224, 12 April, 1929G

২৯.Umm al Qura number 224 described the arrival of the women: '........ when his majesty saw the women coming to ask for pardon he wept, and all those present wept too on account of such a pitiful sight. His majesty's heart and the hearts of all troops were touched and so he agreed to the entreaty of the women.......'.

৩০.Umm al Qura, number, 224.

৩১.Ibid.

৩২.Muhammad Ibn Abdullah Al. Abdal-Qadir Al-Assari Al-Ahsai, Tarikh al-Aksa, Riyadh Publishing Company, 1960, PP. 230-231.

৩৩.Muhammad Asad., Road to Mecca, PP. 259-261.

৩৪.Military Aid to Ibn Saud, Public Record Office 1929. Mss. Vol. 13736, Document No. E 2380, 8 May 1929.

৩৫.Ummal-Qura, number 239, 31 July 1929.

৩৬.Habib, P. 143.

৩৭.Abd-al-Hamidal-Khatib, Al-Imam Al-Adil Cairo: no date of publication given, PP. 174-177.

৩৮.Ibid., P. 180.

৩৯.Now a favorite hunting spot of the Saudi Royal Family.

৪০.Umma al-Qura number 293, 18 July 1930.

৪১.Dickson, the Arab of the Desert, London, 1949, P-161.

৪২.Cabele from colonel Bisco, 17 January, 1930, Public Record Office, Mss,

Dhaka University Institutional Repository

Foreign Office, Vol-14449, Doc. No. E275.

৪৩.Dickson, Kuwait, P. 320.

৪৪.Consul General Bisco to Lord Passfield, February 26, 1930, Public Record Office Mss. Foreign Office Vol. 14451. Doc. No. E 1981.

৪৫.Dickson, Kuwait PP. 122-123.

৪৬.Ibid., Separate, numbered, unlettered attachment.

৪৭.Extract from Glubb Report, 20 May, 1930, Public Record Office, Mss. EO. Vol. 14451, Document No. E 2578.

৪৮.Dickson, Kuwait, P. 329.

৪৯.Ibid., P. 325.

৫০.Personal interview in Al Ghat Ghat, March 1968, Habib P. 154.

৫১.Philby Arabian Days, London, 1948, P. 145.

৫২.Motoko Katakua, Beduin Village; A study of the Saudi Arabian people in transition, Tokyo: University of Tokyo Press, 1977.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইখওয়ানের পরিণতি

"আমি সত্যি খোদার উপর একনিষ্ঠ তাওহীদের বিশ্বাসীগণের লাব্বায়েক বলার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী। শরীয়ত বিরোধীদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ঘোষণাকারী। ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে আমাদের তীব্র ক্রোধ থেকে সাবধানে থাকা চাই"। (সিবিলা যুদ্ধে আব্দুল মোহসেন আল ফারম কবিতার এই অংশ যুদ্ধ গীতিরূপে পাঠ করেছিলেন)।(১)

১৯২৮-২৯ সালের ইখওয়ান বিদ্রোহ সউদী আরবের রাজনৈতিক নাটকের চূড়ান্ত পর্যায়। উক্ত বিদ্রোহে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের রাজ্যের বুনিয়াদ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

১৯২৭ সালের শেষের দিকে সউদী আরবের বিশাল এলাকায় শান্তি বিরাজ করছিল। তখন রাজা ইবনে সউদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এ সময় নজদে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। হাইল এবং শাম্মারদের এলাকা ইবনে সউদের অধীন। ১৯২৫ সালে হেজাজ থেকে শরীফ হোসাইন বংশের বহিষ্কারের পর হেজাজও এখন তাঁর রাজ্যভুক্ত। সে সময়ে ইবনে সউদের যোদ্ধাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন দুঃসাহসী বেদুঈন সরদার ও ইখওয়ান নেতা ফয়সল আদ-দুবেশ। ইবেন সউদ তাঁর উপরে পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন নি।(২) আরবীতে প্রবাদ আছে যে, বেদুঈনরা অদ্য আমীরের সাথে তলোয়ার চালায় পরবর্তী দিন তার পিঠে তলোয়ার চালায়।(৩) মধ্য আরব একটি বেদুঈন অধ্যুষিত এলাকা। বেদুঈনরা খুবই চঞ্চলমতি। তাদের মত বদল হয় সহজেই। যে মুহূর্তেই কোন দল জয়ী হতে

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে মনে হতো তাদের দলেই তারা যোগ দিত। এধরনের দ্বিমুখী আচরণ ফয়সল আদ-দুবেশেল মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।(৪) ইবনে সউদের সহকর্মী রূপে আদ-দুবেশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কাজের মাধ্যমে ইবনে সউদের প্রতি তাঁর আনুগত্য বার বার তিনি প্রমাণ করেন।

ক. ১৯২১ সালে তিনি ইবনে সউদের পক্ষে হাইল জয় করেন।

খ. ১৯২৪ সালে তিনি ইরাকের অভ্যন্তরে এক দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন। সেখান থেকে বৃটিশের ছত্রছায়ায় শরীফ হোসাইনের পরিবার ইবনে সউদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল।

গ. ১৯২৫ সালে তিনি মদিনা জয় করেন।

ঘ. একই সনে জেদ্দা জয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

উপরোক্ত সাফল্যের খ্যাতি ও সন্তুষ্টি লাভ করে ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মে তিনি আরতাবিয়ার ইখওয়ান হিজরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ইরাক সীমান্ত থেকে আরতাবিয়া বেশী দূরে নয়।(৫)

বহু বছর ধরে ঐ সীমান্তটি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বেদুঈন হামলার ক্ষেত্র ছিল। চারণ ভূমি ও পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়া বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এই হামলা চালিয়ে এসেছে। ইবনে সউদ এবং ম্যানডেটরী শক্তি হিসেবে ইরাকের পক্ষে বৃটিশের মধ্যে অনেকগুলি চুক্তি হয়। এইসব চুক্তির শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিলঃ-

হিজরা সমূহের সম্মুখে ইখওয়ানের যাতায়াতে কোন বাধা সৃষ্টি করা চলবে না।
নজদ - ইরাক সীমান্তের কোন পাশেই কোন প্রাচীর বা দুর্গ নির্মাণ করা যাবে না।

এইসব চুক্তির শর্ত লংঘন করে ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মে বুসাইয়ার সীমান্তবর্তী কুয়াগুলোর নিকটে ইরাক সরকার একটি দুর্গ নির্মাণের পর সেখানে সৈন্য মোতায়েন করে। ইরাকের সীমান্ত বরাবর আরও দূর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। ফলে উত্তর নজদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করে। কারণ যে সব কুপের উপর তারা নির্ভর করতো সেগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ইবনে সউদ এই চুক্তি ভঙ্গের বিরুদ্ধে ইরাকের কাছে প্রতিবাদ জানান। কয়েক মাস

Dhaka University Institutional Repository

পর ইরাকে অবস্থানরত বৃটিশ হাই কমিশনারেরপক্ষ থেকে তিনি একটি দ্ব্যর্থবোধক উত্তর পান।(৬)

সদা উদ্যোগী কর্মচঞ্চল ফয়সল আদ-দুবেশ ভাবলেনঃ বৃটিশের সাথে বিবাদ করা ইবনে সউদের জন্য সমীচীন নাও হতে পারে। তবে সেটা আমিই করবো। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে তিনি তাঁর ইখওয়ানের দলপতি হিসেবে বুসাইয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষী ইরাকী বাহিনী তাঁর আক্রমণের মুখে কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেননি। দুর্গটি ধ্বংস হয়ে যায়। বৃটিশের যুদ্ধ বিমান আকাশে দেখা যায়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে একটি বোমাও না ফেলে তারা ফিরে যায়। ইবনে সউদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এই হামলা বন্ধ করা যেতে পারত। পরে কুটনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দুর্গগুলোর সমস্যার সমাধান করা যেতো। কিন্তু বৃটিশ-ইরাকী সরকার সীমান্ত সমস্যার আশু এং শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রাহান্বিত ছিল বলে মনে হয় না।

ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য নজদের গোত্রগুলো ইবনে সউদের নিকট দাবী জানায়। ইবনে সউদ উক্ত দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে সউদ আদ-দুবেশকে সীমা লংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি সীমান্ত এলাকার উপর কড়া নজর রাখার জন্য হাইলের আমীর ইবনে মুসয়াদকে নির্দেশ দেন। ইবনে সউদ ইখওয়ানের অধিকাংশ সদস্যকে আর্থিক ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি দুবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন গোত্রগুলোর ইখওয়ান সদস্যদের ভাতা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। ইবনে সউদ সিদ্ধান্তগ্রহণ না করা পর্যন্ত আদ-দুবেশকে আরতাবিয়ায় অপেক্ষা করতে বলেন। ইবনে সউদের এসব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ইরাক সরকারকে অবহিত করা হয়। আদ-দুবেশকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার বিষয়টিও তিনি জানিয়ে দেন। ভবিষ্যতে সীমান্ত চুক্তিগুলো আরও কঠোর ভাবে মেনে চলার জন্য তিনি ইরাকের কাছে দাবী জানান।

উপরোক্ত সংঘর্ষ ধৈর্য্যের সাথে এভাবে সহজেই অবসান করা যেত। কিন্তু সংঘর্ষের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, বৃটিশ হাই কমিশনার ইবনে সউদকে আদ-দুবেশের নেতৃত্বাধীন ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক স্কোয়াড্রন বিমান পাঠাতে চান। অবশ্য ইখওয়ান সদসগণ এই ঘটনার অনেক আগেই তাদের নিজ

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে ফিরে যায়। যেহেতু রিয়াদে তখন কোন টেলিগ্রাম অফিস ছিল না। ইবনে সউদ বাগদাদে বৃটিশ দূতাবাসে একটি টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য বাহরাইনে এক দূত পাঠান। এই টেলিগ্রামে বৃটেন কর্তৃক বিমান বাহিনী পাঠাবার প্রস্তাব নিষ্প্রয়োজনে বাতিল করতে বলা হয়। সবশেষে ইবনে সউদ আশংকা করেন যে. - নজদ অঞ্চলের বৃটিশ বিমান হামলা হলে ইখওয়ানের মধ্যে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। কারণ ইখওয়ান সদস্যরা তখন বৃটেনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ ছিল।

বুসাইয়া ঘটনার তিন মাস পর ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে বৃটিশ সরকার ইবনে সউদের আবেদন উপেক্ষা করে এক স্কোয়াড্রন বৃটিশ বিমান ইরাকী সীমান্তের বাইরে পাঠান। উক্ত বিমান বাহিনী নজদী এলাকায় বোমা বর্ষণ করে। মৌতায়ের গোত্রের বসতিগুলো ধ্বংস এবং নারী-পুরুষ ও গৃহপালিত পশু হতাহত হয়। এর ফলে নজদের উত্তরাঞ্চলের সকল ইখওয়ান ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময়ে ইবনে সউদের হস্তক্ষেপের কারণে অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। তবে, সীমান্তে ছোটখাট কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। ইত্যবসরে গোপনে বৃটিশ সরকার বুসাইয়ার দুর্গটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং আরও দু'টি নতুন দুর্গ নির্মাণ করে।

ফয়সল আদ-দুবেশকে রিয়াদে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি রিয়াদে আসতে রাজী হন না। কারণ তাঁর মতে তিনি যা করেছেন ইবনে সউদের স্বার্থেই সব করেছেন।

ফয়সল আদ দুবেশ ইবনে সউদের পক্ষে যাবতীয় কাজ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমাধা করেছিলেন। বিনিময় তাঁকে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আরতাবিয়ার আমীর বানানো হয়। তাঁর নেতৃত্বে হাইল বিজিত হয়। কিন্তু তাঁকে হাইলের আমীর নিযুক্ত করা হয়নি। ইবনে সউদ তাঁর পিতৃব্য পুত্র ইবনে মুসাদকে হাইলের আমীর নিযুক্ত করেন। আদ-দুবেশই হেজাজ অভিযানকালে দীর্ঘদিন মদিনা অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে শরীফ হোসাইনের অনুসারীদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। আদ-দুবেশকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়নি। ইবনে সউদ তাঁর ঘনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদকে আমীর নিযুক্ত করেন। এইভাবে ইবনে সউদ দুবেশকে তাঁর প্রাপ্য ক্ষমতা ও মর্যাদা দেন না। ফলে দুবেশের মনে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্কুচিত হতে থাকে। তদুপরি আদ-দুবেশ ভাবেন, ইবনে সউদ আনাজা গোত্রের আর তিনি মোতায়ের গোত্রের আভিজাত্যের দিক দিয়ে একে অপরের সমান। কেন তিনি ইবনে সউদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিবেন। এ ধরনের অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি চিরদিনই আরবদের বিবাদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে। কেউ কারোর শ্রেষ্ঠত্ব মানেনি।

আর একজন ইখওয়ান নেতা সুলতান ইবনে বিজাদ। তিনি শক্তিশালী উতায়বা গোত্রের শেখ এবং নজদ অঞ্চলের বৃহত্তম ইখওয়ান বসতি ঘাতঘাতের আমীর ছিলেন।(৭) তিনি ১৯১৮ সনে শরীফ হোসাইনের সেনাদের বিরুদ্ধে তারাবার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৯২৪ সনে তিনি তায়েফ ও মক্কা জয় করেন।(৮) কেন তিনি ঘাতঘাতের আমীর হয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন? তাকে কেন মক্কার আমীর না করে ইবনে সউদের পুত্র মুহাম্মদকে আমীর করা হলো? কেন তাঁকে ন্যূনতম তায়েফের আমীর করা হয় না? ফয়সল-আদ-দুবেশের ন্যায় ইবনে বিজাদের বিবেচনায় - যা তাঁর প্রাপ্য তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুলতান ইবনে বিজাদ আদ-দুবেশের ভগ্নিপতি ছিলেন। তাই দু'জনই ইবনে সউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে একজোট হওয়া একান্তই যুক্তি সঙ্গত ছিল।

১৯২৮ সনের শরৎকালে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য ইবনে সউদ রিয়াদে এক সম্মেলন ডাকেন। ইবনে বিজাদ ও আদ-দুবেশ ব্যতিত গোত্রপতি ও আলেমগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। বিদ্রোহী নেতা আদ-দুবেশ ইবনে সউদকে একজন অমান্যস বলে অভিযুক্ত করেন। তাঁকে ধর্মাচরণ ভঙ্গকারী বলা হয়। কারণ তিনি কি কাফেরদের সাথে চুক্তি করেন নি? আরব দেশে কি মটরযান, টেলিফোন, বেতারযন্ত্র ও উড়োজাহাজের মত শয়তানের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করেননি?(৯) রিয়াদ সম্মেলনে যে সব আলিম অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা সর্ব সম্মতিক্রমে ঘোষণা করেনঃ উপরোক্ত নতুন কারিগরী যন্ত্রপাতি প্রবর্তন ইসলাম বিরোধী কাজ নয়। এসবের সাহায্যে মুসলমানদের জ্ঞানের পরিধি এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা বিশ্বনবী (সঃ) এর হাদীসের উল্লেখ করে ঘোষণা দেনঃ অমুসলমান শক্তির সঙ্গে প্রয়োজনে চুক্তি স্থাপনও ধর্ম বিরোধী কাজ নয়। যদি তা মুসলমানদের কল্যাণকর হয়।(১০) কিন্তু ফয়সল আদ-দুবেশও ইবনে বিজাদ দুই নেতা ইবনে সউদের বিরুদ্ধে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দাবাদ অব্যাহত রাখেন।

ইবনে সউদ ইখওয়ানকে শিক্ষিত এবং প্রকৃত ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। তার ফলে তাঁর সঙ্গে ইখওয়ানের মতভেদ ও বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

আঠারো শতকের মহান মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের শিক্ষার প্রতি ইখওয়ানের আপোষহীন আনুগত্য ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা যাকে সঠিকভাবে ইসলামী সমাজ বলা যেতে পারে।(১১) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। ইবনে ওয়াহাবের মতানুযায়ী যাবতীয় বেদ'আত পরিত্যাজ্য। ইখওয়ান সদস্যরা ওয়াহাবী মতবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যা উদ্ভাবিত হয় পশ্চিম জগতে প্রয়োজনে তার ব্যবহার যে অনৈসলামিক কাজ নয় এই ধারণা তাদের ছিল না।

ইসলাম সম্পর্কে ইখওয়ান সদস্যদের জ্ঞান ছিল প্রাথমিক পর্যায়। যদি তারা ইসলামের জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে পেত তা হলে তাঁরা সবরকম গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে পারত। ইবনে সউদ ইখওয়ানকে এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যা শুধুমাত্র তাঁর ক্ষমতা দখলের কাজে লাগাতে পারেন।

১৯২৬ সনে নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠনের পর অনিয়মিত ও সহায়ক শক্তি হিসাবে ইখওয়ানের প্রয়োজনীয়তা আর ইবনে সউদের ছিল না।(১২) তদুপরি ইখওয়ানের প্রাপ্য পদ-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে আত্মীয় স্বজনকে ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া ইখওয়ানকে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

এরপর বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় ইবনে সউদ এবং ইখওয়ান একে অন্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উভয়কে বিভিন্ন সময় বৃটেন অস্ত্রশস্ত্র যোগায়। শেষ পর্যন্ত ইবনে সউদের প্রতি বৃটেনের সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যা ইখওয়ানকে দমন করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ইবনে সউদের রাজ্য বিস্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ১৯২৪-২৫ সালে। যখন তিনি মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দাসহ সমগ্র হেজাজ জয় করেন। মধ্য প্রাচ্যের প্রায় সব দেশই যখন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল। ঠিক সেই সময় ইবনে সউদের

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা গোটা আরব জাহানে এক প্রবল আশার সঞ্চার করে। তাদের ধারণা ছিল আরবে একজন এমন নেতার আবির্ভাব হয়েছে যিনি সমগ্র আরব জাতিকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। তিনি একটি যথার্থ-ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। পরিণামে ঘটনা অন্য মোড় নেয়। তাঁর ক্ষমতা যখন সুসংহত হয় তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইবনে সউদ গতানুগতিক প্রাচ্য দেশীয় একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইবনে সউদ মহৎ ও ন্যায়পরায়ন বন্ধু বাৎসল হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারেন নি এবং একটি জনকল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন।

বিদ্রোহী ইখওয়ান নেতাদের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন বিভিন্ন গোত্রের লোক। গোত্র নেতারা গোপন বৈঠক করতে লাগলেন। অবশেষে ইবনে সউদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নেয়। তাতে মুতায়ের এবং উতায়বা গোত্রের সঙ্গে আরও বহু গোত্র জড়িয়ে পড়ে। ইবনে সউদ এ বিদ্রোহে বিচলিত হননি। তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। তিনি বিদ্রোহী গোত্রনেতাদের নিকট পত্র দিয়ে দূত পাঠান। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। মধ্য ও উত্তর আরব গেরিলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমগ্র নজদে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে সউদের প্রতি যে সব গ্রাম, কাফেলা এবং গোত্রের লোক অনুগত ছিল বিদ্রোহী ইখওয়ান তাদের উপর আঘাত হানে।

ইবনে সউদের অনুগত গোত্র ও বিদ্রোহী গোত্রগুলোর মধ্যে স্থানীয় পর্যায় অসংখ্য ছোট ছোট সংঘর্ষ হয়। অতঃপর ১৯২৯ সালের বসন্তকালে মধ্য নজদের সিবিলা ময়দানে এক যুদ্ধে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয়। এক পক্ষে ইবনে সউদের বিশাল সেনাবাহিনী। অপরপক্ষে মুতায়র ও ওতায়বা গোত্রের সমর্থনপুষ্ট অন্যান্য গোত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইবনে সউদ বিজয়ী হন।(১৩) ইবনে বিজাদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে বন্দী করে রিয়াদে আনা হয়। আদ-দুবেশ মারাত্মক আহত হন।(১৪) ইবনে সউদ তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে ফয়সল আদ-দুবেশের চিকিৎসার জন্য পাঠান। সিরিয়ার সেই তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করে দুবেশের কলিজায় মারাত্মক যখমের রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয় ফয়সল আদ-দুবেশ বড়জোর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারেন। ডাক্তারের মুখে একথা শোনার পর ইবনে সউদ মন্তব্য করেন:ঃ 'আমরা চাই আদ-দুবেশ শান্তিতেই মৃত্যুবরণ করুক। তিনি তাঁর প্রাপ্য শাস্তি আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছেন'। তিনি আহত দুবেশকে আরতাবিয়ায় তাঁর পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু ফয়সল আদ-দুবেশের মৃত্যুর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তরুণ ডাক্তার দুবেশের আঘাত যতটা গুরুতর মনে করেছিলেন, আসলে ততটা ছিল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ইবনে সউদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি আরতাবিয়া থেকে পালিয়ে যান।

ফয়সল আদ-দুবেশের আরতাবিয়া থেকে পলায়ন বিদ্রোহের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি কুয়েত সীমানার কাছাকাছি কোথাও অবস্থান নেন। সেখান থেকে উপজাতিগুলোর মধ্য থেকে নতুন মিত্র সংগ্রহ করেন। তাঁর নিজস্ব বাহিনী ছিল মোতায়ের গোত্র। তাঁর সাথে একটি ছোট্ট অথচ দুর্ধর্ষ উজমান গোত্র যোগ দেয়। ওজমানরা পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী আল-হাসা প্রদেশে বসবাস করতো। তাদের শায়খ ইবনে হাজলায়েন ফয়সল আদ-দুবেশের মামা ছিলেন। ইবনে সউদ ও ওজমান গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। ওজমান গোত্রের লোকেরা কয়েক বছর আগে ইবনে সউদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সা'দকে হত্যা করেছিল। ইবনে সউদ পরে তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শণ করেন। তাদেরকে পৈত্রিক আবাস ভূমিতে ফিরে আসারও অনুমতি দেন। তবুও বিক্ষোভ বাড়তেই থাকে। বিদ্রোহী গোত্র ও ইবনে সউদের মধ্যে আলোচনাকালে ইবনে সউদের আত্মীয় আল-হাসার আমীরের জেষ্ঠ্যপুত্রের তাবুতে ওজমানদের নেতা এবং তার অনুসারীদের কয়েকজনকে ইবনে সউদের লোকেরা বিশ্বাস ভঙ্গপূর্বক হত্যা করে। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সংঘর্ষ শুরু হয়।

মুতায়ের এবং ওজমান গোত্রের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মধ্য নজদের ওতায়বা গোত্রগুলোর মধ্যে নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আমীর ইবনে বিজাদ বন্দী হবার পর ওতায়বা গোত্রের লোকেরা মজিদ আল-বাররাক-এর অধীনে সমবেত হয়। (১৫) ইবনে সউদের বিরুদ্ধে আবার তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সউদ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁর সকল শক্তি উত্তর নজদ থেকে দক্ষিণ নজদে স্থানান্তরিত করেন।

সউদী বাহিনী এবং ওতায়বা গোত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ইবনে সউদ এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে বিজয়ী হন। তিনি ওতায়বার বিভিন্ন দলকে পরাভূত করেন । অবশেষে ওতায়বা গোত্র আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। রিয়াদ এবং মক্কার মাঝামাঝি এক গ্রামে শায়েখরা ইবনে সউদের নিকট আনুগত্যের শপথ নেয়। তিনি তাদেরকে আবার ক্ষমা করে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এরপর তিনি ফয়সল আদ-দুবেশ এবং উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু তিনি রিয়াদ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই ওতায়বা গোত্র দ্বিতীয় বারের মত তাদের ওয়াদা ভঙ্গ ও নুতন করে লড়াই শুরু করে দেয়। এ লড়াই ছিল শত্রুকে নির্মূল করার শেষ লড়াই। তৃতীয় বারের মত ওতায়বা গোত্র যুদ্ধে হেরে যায়। এ যুদ্ধে তাদের প্রায় এক দশমাংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে রিয়াদের চেয়েও বড় শহর ঘাতঘাতের ইখওয়ান বসতি ধ্বংস হয়। এভাবে সমগ্র দক্ষিণ নজদে ইবনে সউদের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইবনে সউদের বিরুদ্ধে তখনও উত্তরাঞ্চলে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ফয়সল আদ-দুবেশ এবং তাঁর মিত্ররা ইরাকের সীমান্তের কাছাকাছি পরিখা খুড়ে দৃঢ় অবস্থান নেয়। হাইলের আমীর ইবনে মুসাদ ইবনে সউদের পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর বার বার আক্রমণ চালান। দু'বার রটনা হয় যে, ফয়সল আদ-দুবেশ নিহত হয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই এ খবর মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আদ-দুবেশ ইবনে সউদের নিকট আত্মসমর্পণ কিংবা নতি স্বীকার না করার সংকল্প নিয়ে বেঁচে রইলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সাতশত যোদ্ধা নিহত হয়। কিন্তু তবুও তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। তখন প্রশ্ন ওঠে যে, ফয়সল আদ-দুবেশ এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অস্ত্রশস্ত্র কোত্থেকে পান?

অসমর্থিত এক খবরে জানা যায় যে, যে বিদ্রোহী ইখওয়ান নেতা আদ-দুবেশ এক কালে কাফেরদের সঙ্গে ইবনে সউদের বিভিন্ন চুক্তির ঘোর সমালোচক ছিলেন তিনিই এখন বৃটিশের সঙ্গে গোপন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। জানা যায় যে, দুবেশ ঘনঘন কুয়েত সফর করছেন। লোকে সন্দেহ করে যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞাতসারে আদ-দুবেশের পক্ষে কি একাজ করা সম্ভব? এই সমস্ত গুজবের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কয়েক বছর পূর্বে বৃটিশ হাইফা থেকে বসরা পর্যন্ত একটি রেল লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। বৃটিশের রেলপথ ভারত পর্যন্ত প্রসারিত করার পরিকল্পনা ছিল। ম্যানডেট এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছিল।(১৬) ভূমধ্য সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কেবল একটি নতুন এবং মূল্যবান সূত্রই হবে তাই নয়। বরং ইরাক থেকে সিরীয় মরুভূমির আড়াআড়ি হাইফা পর্যন্ত তেলের যে পাইপ লাইন বসানো হবে তার জন্যও রেল পথের প্রয়োজন।(১৭)

হাইফা এবং বসরার মধ্যে সরাসরি রেলপথ ইবনে সউদের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর উপর দিয়ে যেত। ইবনে সউদ এ ধরনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। বৃটেন তখন সউদী ভূখন্ডের এই এলাকায় যোগাযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নজদ-ইরাক সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিক দুর্গ স্থাপন করেন। যা ছিল বিভিন্ন চুক্তির পরিপন্থী। এতে উক্ত সংকটময় এলাকায় বৃটেনের প্রতি অতি নমনীয় 'একটি ছোট্ট আধা-স্বাধীন বাফার' রাষ্ট্র স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়। ফয়সল আদ-দুবেশ এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারেন। এমন কি এ ব্যাপারে শরীফ বংশের কোন সদস্যের চেয়ে তিনি বেশী উপযুক্ত প্রতিয়মান হয়। কারণ তিনি ছিলেন নজদী এবং ইখওয়ানের মধ্যে তাঁর সমর্থক ছিল অনেক। তাদের কাছে তাঁর ধর্মীয় বাড়াবাড়ি যে একটি মুখোশ ছিল তা স্পষ্ট। তাঁর সব কিছুর মূলে ছিল ক্ষমতা হস্তগত করা। বাইরের সাহায্য ব্যতিরেকে সউদি বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকা কি করে সম্ভব হয়েছিল? ইখওয়ানের বিদ্রোহের পিছনে হয়তোবা গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত ছিল বলে The Road to Mecca-এর লেখক মন্তব্য করেছেন।(১৮)

মুহাম্মদ আসাদের লেখায় প্রকাশ পায় যে, ইউরোপীয় একটি বৃহৎ শক্তি ইখওয়ান বিদ্রোহীদের মদদ যুগিয়েছিল।(১৯) তাঁর লেখায় দেখা যায় যে, এসব ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল সউদী রাজ্যের সীমান্তকে দক্ষিণ দিকে হটিয়ে দেওয়া এবং তার উত্তরের প্রদেশটিকে সউদী আরব এবং ইরাকের মধ্যে একটি 'স্বাধীন' রাজ্য স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করা। যা বৃটেনকে সে এলাকার মধ্য দিয়ে একটি রেল লাইন তৈরীর সুযোগ করে দিবে। এছাড়াও ফয়সল আদ-দুবেশের বিদ্রোহ ইবনে সউদের রাজ্যের মধ্যে বহু বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। বৃটেন ইবনে সউদের নিকট দু'টি কনসেশনের দাবী করেন।

১। জেদ্দার উত্তরে অবস্থিত লোহিত সাগরের বন্দর রাবিগের বৃটেনের নিকট ইজারা দেওয়া। বৃটেন সেখানে নৌবাহিনীর একটি ঘাটি স্থাপনের পরিকল্পনা করে।

২। দামেশক-মদীনা রেল সড়কের যে অংশটি সউদী এলাকার মধ্য দিয়ে যায় তার নিয়ন্ত্রণ। ইবনে সউদ এ দাবী দু'টোর বিরোধিতা করতেন। ফয়সল আদ-দুবেশের হাতে ইবনে সউদের পরাজয় ঘটলে এ দুই পরিকল্পনা বৃটেন বাস্তবায়িত করতে পারত।(২০)

ইউরোপীয় এবং আরবী প্রধানত মিশরীয় পত্রিকাসমূহে এ প্রবন্ধাবলী ছাপানো হলে দারুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।(২১) এতে বৃটিশের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। ফলে হাইফা থেকে বসরা পর্যন্ত বৃটেনের রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে বৃটেন ফয়সল আদ-দুবেশকে কুয়েতের মধ্য দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ কেনার জন্য সাহায্য করেছিল। এর জন্য ইবনে সউদ বৃটেনের নিকট তার তীব্র প্রতিবাদ জানান।(২২)

জবাবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জানায় বিদ্রোহীদের নিকট কুয়েতের ব্যবসায়ীরাই অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তা বন্ধ করার জন্য বৃটেন কিছুই করতে পারবে না। কারণ ১৯২৭ সনে জেদ্দার সন্ধি মোতাবেক বৃটেন আরবে অস্ত্র আমদানীর উপর তাদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে।(২৩) বৃটেন ইবনে সউদকে আরও বলেন তিনিও কুয়েতের মধ্য দিয়ে অস্ত্র আমদানী করতে পারেন।

ইবনে সউদ বৃটেনের প্রত্যুত্তরে বলেন, ঐ একই সন্ধিতে বৃটেন এবং সউদী আরব উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় অপরের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সকল প্রকার কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে বাধ্য ছিল। প্রত্যুত্তরে বৃটিশ বক্তব্য ছিল, কুয়েতকে বৃটিশ এলাকা বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না। কারণ এটি একটি স্বাধীন শেখ শাসিত রাজ্য। বৃটেন এবং আরবের মধ্যে জেদ্দায় সম্পাদিত চুক্তির সঙ্গে কুয়েতের কোন সম্পর্ক নেই।

বৃটেনের এ দ্বৈত নীতির কারণে ১৯২৯ সালের শরতের শেষ পর্যন্ত সউদী রাজ্যে গৃহ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ইবনে সউদ ফয়সল আদ-দুবেশকে কুয়েতের অভ্যন্তরেও ধাওয়া করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। কুয়েত বিদ্রোহীদের আশ্রয়ের জন্য একটি মুক্ত এলাকা ছিল। ইবনে সউদ বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তাঁর মনোভাবের কথা জানিয়ে দেন। বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করা যে, বিপজ্জনক হবে বৃটেন তা বুঝতে পারে। ফয়সল আদ-দুবেশ যাতে পশ্চাদপসরণ করে কুয়েতে প্রবেশ করতে না পারেন সে জন্য বৃটিশ সরকার কুয়েতে-সউদী সীমান্তে যুদ্ধ বিমান আর সাঁজোয়া গাড়ী পাঠান।(২৪) বিদ্রোহী আদ-দুবেশ বুঝতে পারেন তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হবে না। প্রকাশ্য যুদ্ধে ইবনে সউদকে ঠেকানো আর সম্ভব নয়। ইবনে সউদের বিদ্রোহীদেরকে দেওয়া শর্তগুলি সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার ছিল। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ- বিদ্রোহী গোত্র গুলোকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও উটগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। ফয়সল আদ-দুবেশের জীবন রক্ষা করা হবে। কিন্তু তাঁর বাকী জীবন রিয়াদে কাটাতে হবে।

ফয়সল আদ-দুবেশ সক্রিয় জীবন থেকে নিষ্ক্রিয় জীবন মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইবনে সউদের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখান করেন। ইবনে সউদের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। ফয়সল আদ-দুবেশ, ফারহান ইবনে মাশহুর এবং ওজমান গোত্র নেতা নায়েফ আবু কিলাব ইরাকে পালিয়ে যান।(২৫)

ইবনে সউদ ইরাকী কর্তৃপক্ষের কাছে ফয়সল আদ-দুবেশের বহিস্কার দাবী করেন। ইরাকের হাশেমীয় বাদশা ফয়সল ইবনে সউদের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৯৩০ সনের প্রথম দিকে গুরুতর অসুস্থ আদ-দুবেশকে ইবনে সউদের নিকট অর্পণ করা হয়। তাঁকে রিয়াদে আনা হয়।(২৬) কয়েক সপ্তাহ পর যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো আদ-দুবেশের মৃত্যু আসন্ন।

ইবনে সউদ তাঁর চিরাচরিত মহানুভবতার সাথে তাঁকে আরতাবিয়ায় তার পরিবার পরিজনের নিকট পাঠিয়ে দেন। এইভাবে আদ-দুবেশের উত্থান ও সংঘাতময় জীবনের অবসান ঘটে। এরপর সউদী রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহাবী মতবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নজদের দক্ষিণেই রিয়াদে ধর্মীয় সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আবির্ভূত হয়েছিলো। সে সময়ে যারা নামে মাত্র মুসলমান এবং বিভিন্ন গোত্রকে ধর্মীয় এক নয়া আবেগে উদ্দীপিত করেছিলেন তখনকার দিনের অখ্যাত ইবনে সউদ বংশের যারা ছোট শহর দারিয়ার আমীর ছিলেন।(২১) দারিয়ার তৎকালীন সউদী আমীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। আব্দুল ওয়াহাব এবং আমীর মুহাম্মদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরব উপদ্বীপের বিশাল অংশ যে মতবাদ বিস্তার লাভ করে তা ওয়াহাবী মতবাদ নামে পরিচিত।(২৮) গত দুই শতাব্দী ব্যাপী আধুনিক সউদী আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত দক্ষিণ নজদবাসীর মধ্যে ওয়াহাবী মতবাদ সক্রিয় ছিল। উত্তরের লোকেরা নামে মাত্র তাদের সাথে ছিল। কারণ নীতিগতভাবে শাম্মার গোত্র ওয়াহাবী হাম্বলী মজহাবের সাথে একমত হলেও ওয়াহাবীদের ধর্মীয় গোড়ামী থেকে তাঁরা দূরে ছিল। ওয়াহাবীরা চরমপন্থী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরাই ইসলামের একমাত্র অনুসারী। আর অন্যান্য মুসলিম বিপদগামী খারেজী।

ওয়াহাবীরা কোন আলাদা ফেরকা নয়। ফেরকার কথা উঠলেই বুঝতে হবে কতগুলো আলাদা আলাদা মতের অস্তিত্ব রয়েছে। যা একটি ফেরকার অনুসারীদের একই ধর্মের অন্য সকল অনুসারী থেকে আলাদা করে দেয়। তবে ওয়াহাবী মতবাদের কোন পৃথক ধর্ম বিশ্বাস ছিল না। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পর হতে ইসলামে যে সব বিদ'আত অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। নজদে তাঁর শিক্ষার দু'টি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে এ আন্দোলন একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি।

১) ধর্মীয় গোঁড়ামী সংকীর্ণতা দ্বারা এ আন্দোলনকে আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ পালনের মধ্যে সীমিত রাখে। বহিরাবরণ ভেদ করে তার আধ্যাত্মিক মর্মকেন্দ্রে প্রবেশের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে না।

২) তাদের ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভাবধারা গ্রহণতো দূরের কথা শ্রবণ করতেও

Dhaka University Institutional Repository

তারা কখনও রাজী ছিলনা। পরমত প্রকাশে সুযোগ দানে তারা অস্বীকৃতি জানায়। তারা ছিল চরমপন্থী।

মুসলিম সমাজের প্রাণ শক্তিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলাই ওয়াহাবী মতবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এ উদ্দেশ্য তখনই বিচ্যুত হলো যখন এ মতবাদের বাহ্যিক লক্ষ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। আঠারো শতকের শেষের দিকে সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন শুরু হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আরবের বৃহত্তর অংশ আধুনিক সউদী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই ওয়াহাবী মতবাদের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. Mohammed Almana, Arabia Unified, London, 1980, P. 119.

২. হাফেজ ওয়াহবা, জাযীরাতুল আরব ফীল কারনিল ইশরীন, আল-কাহেরা (মিশর) ১৩৮৭ হিজরী, পৃঃ ২৯৫।

حافظ وهبه - جزيرة العرب في قرن العشرين القاهرة ١٣٨٧ه،ص/٢٩٥)

৩. আমীন আর-রীহানী, নজদ ওয়া মুলহাকাতুহ, বৈরুত, ১৯৬৪, পৃঃ ২৬০।

امين الريحان - نجد وملحقاته- بيروت : ١٩٦٤ م ص/٢٦٠.

৪. Muhammad Asad, The Road to Mecca, London, 1954, P. 173.

৫. আহমদ আবদুল গফফুর আত্তার, ছাকরুল জাযীরা, জেদ্দা: ১৩৮৪ হিজরী, পৃঃ ৩১৬।

৬. Asad, Ibid., P. 223.

৭. Helen Lackner, A House Builton Sand, Lond: on 1977, P. 25.

৮. Sheikh Hafiz Wahbah, Arabian Days, London, 1960, PP. 148-149.

৯. Ibid., P. 132.

১০. Ibid. P. 134.

১১. Umm-al-Qura No. 291, 4 July 1929.

১২. শেখ মুহাম্মদ হায়াত, তারীখে সউদী আরব (উর্দু) লাহোর, ১৯৯২, পৃঃ ২৭১।

১৩. Wahbah, Ibid., P. 140.

১৪. Robert Wilson, The Arab of the Desert, London: 1972, P. XXV.

১৫. Johns, Habib, Ibn Sauds Warriors, Netherlands, 1978, P. 171.

১৬. Gary, Troeller, the Birth of Saudi Arabia, London: 1976, P. 42.

১৭. Sluglett Peter, the Precarious Monarchy, London, 1928, P. 43.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. Leather Dale clive, Britain and Saudi Arabia, London, 1985, P. 113.

১৯. Asad, Loccit P. 245.

২০. Clive, Op. Cit. P. 114.

২১. Wahbah, Op. Cit. P. 143.

২২. Bond (Jedda) to Fo No. 255, 30 September, 1929.

২৩. Clive, Op. Cit. P. 113.

২৪. Almana, Op. Cit. P. 136.

২৫. Ibid, P. 138.

২৬. Meulen D. Vander, The Wells of Ibn Saud, New York, 1957, P. 67.

২৭. Clive, Op. Cit. P. 14.

২৮. Lackner, Op. Cit. P.10.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ইখওয়ানের অবদান

আবদুল আজিজ ইবনে সউদ আরব উপদ্বীপকে একিভূতকরণে ইখওয়ান আন্দোলনকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ও গতিশীল পদক্ষেপ আরব উপদ্বীপের বৃহত্তর অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এ ব্যতিত আরব উপদ্বীপকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে ইখওয়ান আন্দোলন ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ একক শক্তি। ইখওয়ান আন্দোলনের ধারাবাহিক সময়কাল সংক্ষিপ্ত ছিল। তা সত্ত্বেও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এবং মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টিতে এর অবদান ছিল অপরিসীম। এ আন্দোলনের অবসানের পরও তাদের সহায়তায় গঠিত এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর এদের প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়। সমগ্র দেশে আজও বহুক্ষেত্রে ইখওয়ানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন - মুহাম্মদিয়া আন্দোলন নামে সংগঠন ও হায়াতুল আমর ওয়ানাহি আনিল মুনকার নামক সংগঠন।(১)

ঐক্যের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবদান ছিল অপরিসীম। এর স্বাতন্ত্র ও তাৎপর্য হচ্ছেঃ

১) খুরমা, তারাবা, তায়েফ, মক্কা, হাইল ও জওফ এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকা সমূহ ইখওয়ানের সাহায্যে ইবনে সউদের দখলে আসে। ইখওয়ানের প্রবল প্রতাপে হাইল অঞ্চলে অন্য কেউ বিদ্রোহ কিংবা গোলযোগ সৃষ্টি করার সাহস পায়নি।

২) ইখওয়ান সদস্যরা জর্দান, কুয়েত ও ইরাকী সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

চালায় এবং তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সউদী বংশকে ধ্বংস ও নস্যাত করতে হাশেমীয় চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

৩) প্রাত্যহিক জীবনে তাদের ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার অদম্য প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ইতিপূর্বে উপদ্বীপের গোত্রীয় লোকদের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। হেজাজের সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের জাতীয়তাবোধ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সামাজিকভাবে প্রকাশ না পেলেও তার প্রভাব পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

স্বল্প ব্যয় এবং স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধা ব্যবহার দ্বারা ইখওয়ান সদস্যরা সবচেয়ে বেশী ভূ-খন্ড দখল করতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল ভিনটেজ রাইফেল অথবা স্থানীয় ক্রুডবর্শা। তাদের রসদ ছিল এক মুঠো খেজুর ও এককাপ ময়দার খাবার। জনকোষাগার থেকে সামান্য অর্থ নিয়ে যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের উদ্দেশ্যে যা খরচ হতো তা অতি সামান্য। বিজয়ের পর পশুসম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো তা তাদের জন্য ব্যয়কৃত সম্পদের চেয়ে ইখওয়ান সদস্যরা বিপুল সম্পদ কোষাগারে জমা দিত। কিন্তু তাদেরকে নিয়মিত এবং সম্মানসূচক কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। তারা শুধুমাত্র তাদের জীবদ্দশায় সরকার কর্তৃক হুজারে অবস্থান কালে ভর্তুকি পেতেন।

ইবনে সউদ ও বিদ্রোহী ইখওয়ান উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে শত শত ইখওয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। ভাল সমরাস্ত্রের অভাব ও অপ্রতুল সামরিক প্রশিক্ষণও এই মৃত্যুর আংশিক কারণ ছিল। আর একটি কারণ তাদের নতুন অঙ্গীকার ছিল যুদ্ধ ও মৃত্যু। কিন্তু কখন পশ্চাদপসরণ কিংবা আত্মসমর্পণ নয়। নাস্তিকদেরকে কোন দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হতো না। যুদ্ধবন্দীদের তৈজষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতো। ইখওয়ান সদস্যরা খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী যারা উন্নত জীবন যাপন করত তাদের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে না। যথাযথ সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গেও তাদের তুলনা করা যায় না। যারা ভূ-খন্ড প্রাপ্তি বা বৈষয়িক সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে লোভ লালসা দ্বারা তাড়িত হয়ে দুর্বলদের উপর নিপীড়ন চালায় তাদের সাথেও এদের তুলনা চলেনা। ইখওয়ান সদস্যরা ভূ-খন্ড সম্প্রসারণ ও লুণ্ঠিত মালামাল মওজুদ করেছে সত্য, কিন্তু তা গৌণ। ওয়াহাবী আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ইখওয়ান সদস্যদের বিজয়ের পরবর্তীকালে ভাল জীবন যাপন করতে পারেনি। এমন কি তারা বিজিত এলাকার সম্পদ নিজেদের ভোগের উদ্দেশ্যে আত্মসাতও করেনি। বিস্তীর্ণ আরব ভূ-খন্ডে এবং আবহমানকাল থেকে গোত্রে গোত্রে যে সংঘর্ষ হত ইখওয়ান তার চেয়ে নিষ্ঠুর কিছু করেনি। যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালামাল গৃহপালিত উট, ছাগল, গরু হয়তো ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু আরবে এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তা সত্ত্বেও কোন এলাকায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়নি। ফসলাদি বিনষ্ট বা শহর বন্দর ও ধ্বংস করা হয়নি। তায়েফে একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ব্যতিরেকে শহর বন্দর গ্রাম-গঞ্জ ও আবাসিক স্থলের তেমন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। দক্ষ সার্জনের মত অস্ত্রপ্রচার করে আরব সমাজ দেহের ব্যাধিগ্রস্থ অংশকে কেটে ফেলে দিয়ে সুস্থ্য অংশকে অক্ষুণ্ন রাখে।

অভ্যন্তরীণ সংকট সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় সউদী ভূ-খন্ড ঐক্যবদ্ধ থাকতে পেরেছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রশাসনে আংশিক রদবদল করা হয়। ইখওয়ানের হাম্বলী মজহাব কর্তৃক বাধ্যতামূলক ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তিত কিছু ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তন ব্যতিরেকে এলাকাবাসীর জীবন ধারার ক্ষতিকর কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। যেমন ফরজ নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা ইত্যাদি। এই যৎ সামান্য ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তন করে সউদী সরকার সেখানে প্রশাসনিক অবকাঠামো এমনভাবে সুসংহত করেন যা আজ পর্যন্ত অনেকাংশে অটুট আছে। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ তাঁর রাজ্যে কঠোর আইনও অপরাধের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনজীবনে শৃংখলা ও নিরাপত্তাদানে সমর্থ হন।(২)

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সউদ ইসলামের ন্যায়নীতি সঠিকভাবে পালন ও প্রতিষ্ঠার কথা সব সময় বলতেন। যখন ওয়াহাবী আদর্শের নেতৃত্বের চেয়েও রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্য মূখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনও তিনি ওয়াহাবী আদর্শের লক্ষ্য ভুলে যান নি। মক্কা-মদীনার হজ্জ্ব কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হয়। হজ্জ্ব যাত্রীরা প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পান। ফলে হজ্জ্ব যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। হজ্জ্ব যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত জনগণ এদদ্বারা আর্থিকভাবে উপকৃত হন। এই সুযোগের সদব্যবহার শুধু হেজাজবাসীই নন, নজদবাসীরাও সমভাবে গ্রহণ করেন।

হাইল বিজয়ের পর ইবনে সউদ আল-রশীদের কিছু ছেলে মেয়েদের নিজ সন্তানের মত লালন পালন করার দায়িত্ব নেন।(৩) তিনি রশীদ গোত্রীয় কিছু মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অন্য দিকে তাঁর কিছু সহযোগী কর্মী রশীদ পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এইসব বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবা পত্নী এবং তাদের সন্ততির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়ায় তাদের সঙ্গে ইবনে সউদের রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ে ওঠে। দুশান গোত্রের লোকেরা যদিও ইবনে সউদের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করেছিল তথাপি উক্ত গোত্রের অনেক মহিলাকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। আরতাবিয়া এলাকা দুশান গোত্রের স্বশাসনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মজিদ ইবনে খাতলা ইবনে বিজাদের একটি ঔদ্যত্বপূর্ণ চিঠি ইবনে সউদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি ইবনে সউদ তাকেও ক্ষমা করেন। পরে তাঁকে পশু পালন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। তিনি ইবনে সউদের অন্যতম বিশ্বস্ত উপদেষ্টাও ছিলেন।

ইখওয়ান বিদ্রোহের অবসানের পর ইবনে সউদ অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।(৪) এরপর ইখওয়ান তাদের স্বস্থানে ফিরে যায়। একটি অর্থবহ আন্দোলন হিসেবে ১৯৩০ সালে এর পরিসমাপ্তি ঘটলেও ফয়সল আদ-দুবেশ ও অপরাপর ইখওয়ান নেতাদের অন্তর্ধানের পর ইখওয়ান বাহিনী জর্দানে তাদের সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে।(৫) জর্দান উত্তর পশ্চিম আরবে গোত্রনেতা রশীদাহ বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাচ্ছিল।(৬) জর্দানের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

বিন হোসাইন আরব উপদ্বীপে হাশেমীয় শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় সউদী আরবের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের উস্কানী দিতে থাকেন।(৭) ইবনে রফীদাহ বিদ্রোহ দমনে ইখওয়ানের অংশ গ্রহণ ইখওয়ান আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ ধারা অধ্যায়নে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই বিষয়ে ইখওয়ান পরিণতি কি হয়েছিল তা জানতে। কারণঃ প্রথমতঃ এখানেই প্রথম বারের মত এই ইখওয়ান বাহিনীকে নতুন ভূ-খন্ড আধিকারের পরিবর্তে সউদী রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয়তঃ এখানে ইখওয়ান বাহিনী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ও নির্দেশে তাদের দায়িত্ব পালন করে। বাস্তবে তারা ছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনী বা শ্বেতসৈন্য বাহিনীর নিকট অনিয়মিত ইউনিট যাকে বলা হত 'লিওয়াস'। বস্তুত এরাই ছির অগ্রগামী বাহিনী। ইখওয়ান লিওয়াস বাহিনী তখনও তাদের হুজারে অবস্থান কত এবং গোত্রীয় বাহিনী হিসেবে রাইফেল ও পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্থানীয় আমীরের সরাসরি নেতৃত্বে শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলা করত।

ইখওয়ান আন্দোলনের অবসানের পরে ও দেশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক - ধর্মীয় শক্তি হিসেবে তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।(৮) যাযাবর জীবনে ফিরে না গিয়ে তাদের অধিকাংশই হুজারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্থায়ী জীবন যাপন করে। দরিদ্র হলেও তারা গর্বিত। তারা ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং শরীয়া আইনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখে। যদিও তারা কম গোঁড়াপন্থী ছিল না। তবুও সেই গোঁড়ামী কম অনুভূত হত।(৯) যখন তারা রাজতন্ত্রের প্রতি সামরিক এবং রাজনৈতিক হুমকী স্বরূপ রইল না তখন ধীরে ধীরে তারা সরকারের আস্থা ভাজন হতে থাকে। তারা ছিল শ্বেত বাহিনীর মূল অস্ত্রবাহী অনিয়মিত শাখা। তাদের সন্তানরা ক্রমবর্ধমান সরকারের উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হত। তারা সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হত। ইসলাম, রাজতন্ত্র এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছিল। রাজার প্রতি তাদের আনুগত্য এবং কার্যকলাপের বিনিময়ে তাঁর দরবারে তাঁদের স্থান সহজেই হয় এবং এই ঐতিহ্য বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (১০)

সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃদ্ধ ইখওয়ান সদস্যারা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী কোষাগার থেকে মাসিক ভাতা পেত। মাথাপিছু এই ভাতার পরিমাণ ছিল বার্ষিক কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার ডলার। পূর্ববর্তী সময়ের ইখওয়ান সদস্যদের ছেলে মেয়েরাও হ্রাসকৃত হারে এই ভাতা পেত। এই ভাতা তাদের পিতৃপিতামহের সেই গৌরবময় অতীত দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিত। যখন আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ একজন দরিদ্র যুবক ছিলেন তখন এই ইখওয়ানের পূর্বপুরুষগণ পুরানো অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে ইবনে সউদকে রাজ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই অতীত গৌরবময় অধ্যায় সউদী রাজ সরকারে নিয়োজিত কিংবা হুজরায় অবস্থানরত ইখওয়ান উত্তরসূরীদের মনে আত্মসম্মান দেশাত্মবোধ এবং গৌরবের স্মৃতি যোগাত। এইভাবে সামরিক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা শেষ হলেও ইখওয়ান তার অতীত গৌরব ঐতিহ্য সাফল্যের স্মৃতি বয়ে সউদী আরবের জীবন ধারার সঙ্গে নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু সুনাগরিকরূপে জীবন ধারার সঙ্গে অলক্ষ্যে মিশে আছে।

আধুনিক সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইখওয়ান ছিল সর্ববৃহৎ শক্তি। ১৯১২ সাল থেকে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের নেতৃত্বে ইখওয়ান সংগঠিত হয় এবং তা একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের সময়কাল ছিল ১৯১২ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিভিন্ন বিভক্ত আরবগোত্রকে সংঘবদ্ধ করে তারা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও তৎকালীন আরবে প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলোকে পরাভূত করে। খুরমা, তারাবা, তায়েফ, মক্কা, মদীনা, হাইল, জওফ এবং অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ সামরিক এলাকা সমূহ ইখওয়ানের সাহায্যে ইবনে সউদের দখলে আসে। ইখওয়ান সদস্যবৃন্দ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে জর্দান, কুয়েত ও ইরাকী সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালায়। তারা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সউদী রাজবংশকে ধ্বংস করতে হাশেমীয় চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। তারা স্বল্প ব্যয় এবং কম সংখ্যক যোদ্ধাদ্বারা নজদ এবং হেজাজের বিশাল ভূ-খন্ড দখল করে।

ইখওয়ান আন্দোলনের অবসানের পরও তাদের সহায়তায় গঠিত সউদী

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর এদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইখওয়ান আন্দোলনের ফলে সউদী রাষ্ট্রে কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিঃশেষ হওয়ার পরও ইখওয়ানের প্রভাব সউদী আরবের জীবন যাত্রায় আজও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মোহাম্মদিয়া আন্দোলন এবং হায়াতুল আমর ওয়ানাহি আনিল মুনকার নামক অরাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতা ও কার্যক্রম। ইখওয়ান আন্দোলন তৎকালীন আরব সমাজে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। আবহমানকালের যাযাবর বেদুঈন গোত্র সমূহ তাদের ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে ইখওয়ান কর্তৃক স্থাপিত হুজরায় স্থায়ী ভাবে বসবাসে ব্রতী হয়। উপরোক্ত দু'টি সংগঠনের কার্যাবলী সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়। আরবদের হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ইখওয়ান সদস্যদের ধর্মীয় কৃচ্ছ্র সাধন, নৈতিক শৃংখলাবোধ এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য বিশিষ্ট ভূমিকা রাখে। সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের জাতীয়তাবোধ ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সামাজিকভাবে প্রকাশ না পেলেও তার প্রভাব পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল মিতব্যয়ী। সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইখওয়ান বাহিনী নজদ, হেজাজ ও আসীরের বিরাট ভূ-খন্ড দখল করে। এই সমস্ত যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত সম্পদ তারা রাজকোষে সঞ্চিত করে। হুজরায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাদেরকে যৎসামান্য ভর্তুকি দেওয়া হত। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা সউদী কর্তৃপক্ষের প্রতি ইখওয়া অসন্তুষ্টির একটি মুখ্য কারণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. ডঃ ছালেহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আবুদ, আকীদাতুশ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হিজরী, পৃঃ ৫৯৫ ।

২. Muhammad Asad, the Road to Mecca, London, 1954, P. 17.

৩. আহমদ আব্দুল গফফুর আত্তার, হুকরুল জাযীরাহ, ১ম খন্ড জেদ্দা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৯৮ ।

৪. J.B. Kelly, Arabia, the gulf and the war, New York, 1980, P. 236.

৫. Helen Lackner, A House Built on Sand, London, 1977, P. 21.

৬. John S. Habib, Ibn Sauds Warriors of Islam, Netherlands, 1978, P. 154.

৭. Sheik Mohammad Iqbal, Saudi Arabia, Kashmir, 1986, P. 51.

৮. John L. Esposito, Islam, and Development, New York, 1980, P. 126.

৯. Helen, Ibid., P. 27.

১০. William A. Eddy, "King Ibn Saud, Our Faith and Your Iron". The Middle East Journal 17. No. 3 (Summer 19631, 528).

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ কর্তৃক আধুনিক সউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আরব উপদ্বীপের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আরবে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে নজদের সউদ ও হাইলের রশীদ পরিবারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হাইলের আমীর আল রশীদ সউদ বংশীয়দেরকে তাড়িয়ে নজদ দখল করেন। আমীর আব্দুর রহমান নজদ পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সপরিবারে কুয়েতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুবক আব্দুল আজিজ তখন থেকে পিতার সঙ্গে কুয়েতে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাতের অন্ধকারে কিছুসংখ্যক অনুসারী নিয়ে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ রিয়াদ নগরে প্রবেশ পূর্বক রশীদ বংশের ওয়ালী আজলানকে হত্যা করেন। এই ভাবে তিনি পুরাতন সউদ বংশের রাজধানী রিয়াদ দখল করেন। এরপর পিতা আব্দুর রহমান তাঁকে নজদের আমীর ও ওয়াহাবীদের নেতার পদে স্বীকৃতি দেন। ইবনে সউদ রশীদী পরিবারের শাসক আব্দুল্লাহ আল-আব্দুল আজিজ ইবনে মিতাবকে পরাজিত করে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দখল করেন। এরপর কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অবশিষ্ট রশীদী সেনাবাহিনীকে পরাভূত করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত তুর্কী ও রশীদী সেনাবাহিনী নজদে পরাজিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আল-রশীদের মৃত্যুর পর নজদের উপর আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মক্কা শরীফ দখল করেন। রশীদী পরিবারের শাসক ইবনে মিতাব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান ইবনে মিতাবের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পর মক্কায় ওয়াহাবী মতবাদ এবং সউদী রাজক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ তুর্কী শাসনাধীন আল-হাসা ও অন্যান্য আরব উপসাগরীয় অঞ্চল দখলের চেষ্টা করেন। তিনি বৃটেনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ নির্বাসিত জীবন থেকে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে হতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্দুল আজিজ ইবনে সউদকে রিয়াদের রশীদী রাজপরিবার, মক্কার শরীফ হোসাইন এবং তুর্কী সুলতানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই ত্রিমুখী বিরোধিতা মোকাবেলার জন্য ইবনে সউদ যে সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তারই ফলশ্রুতি ইখওয়ান আন্দোলন।

আরবে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোকাবেলার ক্ষেত্রে আব্দুল আজিজ মূলতঃ দু'টি সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথমটি ছিল অর্থনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সামরিক দুর্বলতা। নজদের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে যে রাজস্ব তিনি পেতেন যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সামরিক দুর্বলতা এর কারণ ছিল তার অনুগত বেদুঈন গোত্রের সদা পরিবর্তনশীল মানসিকতা এবং যাযাবর জীবন যাত্রা। মধ্য আরব ছিল বেদুঈন অধ্যুষিত এলাকা। তাদের সমর্থন অথবা বিরোধিতাই আব্দুল আজিজ ও ইবনে রশীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ে ফলাফল নির্ধারণ করত। মোতায়ের গোত্র প্রধান ফয়সল আদ-দুবেশের সমর্থনের উপরে এই দুই শক্তির জয় পরাজয় নির্ভরশীল ছিল। এই যাযাবর বেদুঈনদেরকে সংগঠিত করার জন্য ইখওয়ানের সৃষ্টি। ইখওয়ান সংগঠনের আদর্শ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রথমে হিজরা নামক স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়। তিনি এ ব্যাপারে ইসলামের অনুশাসনকে অনুসরণ করেন। যাযাবর জীবনের পরিবর্তে স্থায়ী জীবন যাত্রার প্রেরণা যুগিয়েছে ইসলাম।

তিনি বিভিন্ন গোত্রের নিকট ধর্ম প্রচারক পাঠান। তারা ঐসব গোত্রের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। এইভাবে ইখওয়ান সংগঠিত হয়। স্থায়ীভাবে বসতি

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনকারী বেদুঈনরা নিজেদেরকে 'ইখওয়ান' নামে পরিচয় দিতে থাকে। সর্বপ্রথম 'ইখওয়ান' বসতি ছিল মোতায়ের গোত্রের আলওয়া বসতি। আরতাবিয়ায় বহু সংখ্যক হুজার প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে স্থানটি অচিরেই ৩০ হাজার লোক অধ্যুষিত শহরে পরিণত হয়।

ইখওয়ানের ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং যোদ্ধা হিসেবে দক্ষতা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের সামরিক শক্তিকে সুদৃঢ় করে। ইখওয়ানের সাহায্যে পরিচালিত যুদ্ধগুলো জেহাদের রূপ নেয়। আঠারো শতকের মহান মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের শিক্ষার প্রতি ইখওয়ান সদস্যদের আপোষহীন আনুগত্য ছিল। ওয়াহাবী আদর্শ ও মতবাদ ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করা একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল একটি সঠিক ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

আরব উপদ্বীপে সউদী শাসন প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা ছিল ইখওয়ানের। ১৯২৭ সালে জেদ্দা চুক্তির মাধ্যমে সউদী আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে ইখওয়ান সদস্যরা আব্দুল আজিজ বিন সউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইখওয়ানের বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইবনে সউদ রিয়াদে ইখওয়ান আলেম ও নেতাদের এক সভা ডাকেন। উক্ত সভায় আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইবনে সউদকে তাদের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। একই সঙ্গে তারা ইখওয়ানের অবদান স্বীকার করে নেন এবং তাদের প্রাপ্য যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে সম্মত হন। ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ দু'নেতা সুলতান ইবনে হুমায়েদ এবং জায়দান ইবনে হিসলায়েন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেননি। কাজেই এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি এবং ইখওয়ানের বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে।

১৯২৭ সালের ৫ই নভেম্বর ইখওয়ান আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ফয়সল আদ-দুবেশের সহকারী শেখ মুতলুক আল-সুরের নেতৃত্বে একদল ইখওয়ান ইরাকী সীমান্তে এলাকায় বৃটিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বুসাইয়া ফাঁড়ী আক্রমণ করেন। ইখওয়ান সমস্ত পুলিশ ও ফাঁড়ীর কার্যে নিয়োজিত মিস্ত্রিদের হত্যা করেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয় যে বৃটেনের অনুগত মনে করে ফয়সল আদ-দুবেশ, সুলতান ইবনে হুমায়েদ, জায়েদান ইবনে হিসলায়েন ও ইখওয়ানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের নেতৃত্ব ত্যাগের পর ইখওয়ান একটি স্বতন্ত্র সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা নিরীহ গোত্রের উপর অত্যাচার শুরু করে এবং সম্পদ লুন্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। বৃটেন এই অবস্থায় নজদে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এমনিভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি ইবনে সউদের জন্য জটিল ও সমস্যা সংকুল হয়ে পড়ে।

আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ এবং ইখওয়ান একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্র সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। ইবনে সউদ যে ইখওয়ানের সাহায্যে নজদ এবং হেজাজে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন সম্পূর্ণ বিজয়ের পর সেই শক্তির বিরুদ্ধেই তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

ইখওয়ান এবং ইবনে সউদের বিভেদ ও বিরোধের কারণ ছিল আদর্শগত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা বিশেষ। আদর্শগত ভাবে ইসলামে যে সব মূলনীতি তা উভয় পক্ষই মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শুধু ধর্মীয় মতবাদই যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ একটি অনুন্নত দেশকে উন্নত করার জন্য অপরিহার্য। এই জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এই কারণে পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ইবনে সউদ আগ্রহী হন। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ এই বাস্তবতা বোঝেননি অথবা স্বীকার করেননি। তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার পর্যায়ে পড়ে। তারা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ধর্মীয় দিক থেকে পাশ্চাত্য বিরোধী হলেও এর একটি বাস্তব দিকও ছিল। তৎকালীন বিশ্বে বিশেষ করে আরব রাষ্ট্র সমূহে পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাব, নীতি ও কৌশল আরবদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অপমানজনক ছিল। বৃহৎ শক্তিসমূহের কাছে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি অসহায়বোধ করেছে। পাশ্চাত্যের শাসন শোষণ ও নিপীড়ন নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। এসব কারণে পাশ্চাত্যের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সচেতন এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনে দানা বাধতে পারে। ইখওয়ানের পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বেষ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে।

অপরপক্ষে ইবনে সউদ একটি স্থায়ী রাষ্ট্র এবং তার বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই কাজে তাঁর সাহায্যকারী শক্তি ইখওয়ান তাদের কঠোর ধর্মানুরাগের জন্য বাধার সৃষ্টি করে।

ইখওয়ানে বিরোধিতা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা যদি পাশ্চাত্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিরোধিতা করেন তা হলে তারা ইসলামের মূলনীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। যেমন আল-কুরানের বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তাই তারা অনুসরণ করেছিল। কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে, "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না।" ইবনে সউদ বাস্তব কারণে অতটা অনমনীয় থাকতে পারেননি। তাঁকে বৃটেনের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হয়েছিল। তিনি তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও বলিষ্ঠ সহযোগী ইখওয়ানের বিদ্রোহ দমনে বৃটেনের সহযোগিতা নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই জটিল প্রক্রিয়ায় আদর্শের দ্বন্দ্ব না ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কোনটা কতটা সক্রিয় ছিল তা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে ইখওয়ানের অনমনীয়তা এবং ইবনে সউদের বাস্তব ভিত্তিক নমনীয় নীতি গ্রহণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি যদি অমীমাংসিত থাকত তাহলে বর্তমান সউদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কি হতো তা বলা দুরূহ।

ইবনে সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা এবং পরবর্তীকালে বৈরীতা আরব দেশের ইতিহাসে একটি জটিল এবং বিতর্কিত বিষয়। ইখওয়ান তাদের দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ইবনে সউদের বিজয় সুনিশ্চিত করেছিল। কিন্তু পরিহাসের বিষয় যে, এই বিজয়ের গৌরব থেকে শুধু তারা বঞ্চিত হয়নি পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে তাদের প্রাপ্য মর্যাদাও দেয়া হয়নি। এমন কি তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়নও হয়নি। থিসিসে এই বিষয়টির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইখওয়ানের কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। ইখওয়ান তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে কিভাবে বঞ্চিত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইবনে সউদ এবং ইখওয়ানের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং সংকট থেকে সউদী রাষ্ট্রের উত্তরণ কিভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুরূহ সাধ্য। এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি। বস্তুতঃ এই অভিসন্দর্ভে মূল প্রাতিপাদ্য হচ্ছে আবদুল আজিজ বিন সউদের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ কখনও বা শত্রুভাবাপন্ন। সম্পর্কের এই টানাপোড়ন বহুবিধ বাস্তব ভিত্তিক ও মনস্তাত্বিক কারণে ঘটে। এসব কারণ অত্যন্ত জটিল এবং গভীর। এই জটিলতার স্তর ভেদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছি।

আধুনিক সউদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মূলে ইখওয়ানের সঙ্গে আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের সম্পর্ক কতটা সক্রিয় ছিল এবং এতকাল অস্পষ্ট ও পরোক্ষভাবে ইখওয়ানের ভূমিকা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ যে ধারণা বর্ণিত হয়েছে তা আশা করি এই অভিসন্দর্ভে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী ঃ উর্দু ঃ ইংরেজী ঃ

القائمة الببليوجرافية

ابراهيم بن صالح بن عيسي : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الاعيان وانسابهم وبناء بعض البلدان الرياض- ١٣٨٢ه

احمد بن حجر بن محمد : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، عقيدة السلفية ودعوة الاصلاحية - مكة المكرمة -١٣٩٥ه

احمد بن عطية بن عبد الرحمن الزهراني : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامي - مكة المكرمة -١٤٠٢ه

امين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز بيروت -١٩٦٤ه

ملوك العرب او رحلة في بلاد العربية جزان - بيروت ١٢٤م

امين سعيد : تاريخ الدولة السعودة - المجلد الثاني - بيروت ١٣٨٥ه ١٩٦٤م

اضوأ علي تاريخ الكويت - بيروت - دار الكاتب العربي-١٩٦٢م

احمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة - جدة ١٣٨٤ه ١٩٦٤م

بنوا ميشان : سيرة عبد العزيزأل سعود - بيروت

حافظ وهبه : جزيرة العرب في قرن العشرين - القاهرة - ١٣٨٧ه

الشيخ حسن بن غنام - خمسون عاما في جزيرة العرب القاهرد ٩٦٠م

تاريخ النجد- المسمي روضة الافكار- مصر - ١٢٦٨ه

خير الدين الزركلي : الاعلام - دار العلم للملايين ١٩٧٩ه

شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز - بيروت.١٣٩٠ه.١٩٧٠م

Dhaka University Institutional Repository

الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز- بيروت ١٣٩٢ه

مثير الوجد في معرفة انساب ملوك نجد- قاهرة ١٣٧٩ه

عبد العزيز شرف ومجد ابراهيم شعبان - عبد العزيز أل سعود- القاهرة-١٤٠٢

الدكتور عبد الله الصالح العصيمين- نشأة امارة أل رشد-الرياض-١٤٠١ه

عبد الله بن عبد الرحمن ابن صالح أل بسام: تيسير العلام شرح عمدة الاحكام -مكة المكرمة - ١٤٠٣ه -

عبد الفتاح حسن ابو علية - الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز الرياض:١٩٧٦م

صلاح الدين مختار: تاريخ المملكة العربية السعودية بيروت ١٣٩٠ه

صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العيود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية واثرها في العالم الاسلامي - المدينة المنورة ١٤٠٨ه

الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر

عنوان المجد في تاريخ نجد- الرياض ١٣٨٥ه-١

الدكتور مديحه احمد درويش - تاريخ الدولة السعودية - رياض. ١٩٦٤م

مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب - الرياض -١٩٨٨ه

محمد بن عبد الوهاب : كتاب كشف الشبهات -القاهرة ١٣٥١ه

محمد جلال كشك السعوديون والحل الاسلامي - رياض ١٩٦٦م

فواد حمزة قلب جزيرة العرب القاهرة ١٩٣٢م

Dhaka University Institutional Repository

ببليوگرافي (اردو)

شيخ محمد حيات : تاريخ سعودي عرب - لاهور س/١٩٩٢

مفتي محمد عبد القيوم قادري : تاريخ نجد و حجاز - لاهور - ١٣٩٨ه

مولانا محمد رابع ندوي : جزيرة العرب - لكهنوء - ١٩٨٣م

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography : Books

Abdrabboh : Saudi Arabia : Forces of Modernization, London, 1938.

Abir : Saudi Arabia : Society, government and the Gulf Crisis, London, 1948.

Al-Sayyad : Arab Muslim Urbanism, On the Genesis of cities and Caliphs.

Almana Mohammed : Arabia Unified, London, 1980.

Arab Bulletin, 1916-19.

Al-Saleh : Arab Myths and Legends, Fabled Cities Princes and Jinn, 1955, London, 1956.

Archive Edns : Neglected Arabia 1982-1962.

Armstrong H.C. : Lord of Arabia, Ibn Saud An Intimate study of King, London 1934.

Arnold, Jose : Golden Swords and pots & Paus, London 1964.

Asad Muhammad : The Road to Macca, London 1954.

Assah Ahmed : Miracle of the Desert Kingdom, London, 1973.

Autonius George : The Arab Awakening, Beirut, 1938.

Azzi, Robert : An Arabian port folio: Introduction by H.E. Sheikh Ahmad Zaki Yamani, 1976, France.

Azzi, Robert : The Kingdom & its fall, Beirut - 1963.

Baker, Randall : King Husian and the Kingdom of Hejaz, Cambridge, London, 1979.

Barber, Noel : Lord of the Golden Horn, London, 1976.

Bayly winders : Saudi Arabia in the Nineteenth Century. 1965.

Dhaka University Institutional Repository

Bell, Gertrude : Hand book of Tribes. Beirut, 1960.

Burchardt, J.L. : Notes on the Bedouins and Wahabis, London,1831.

Bury, G. Wyman : Arabia Infelix, London 1960.

Chessman, Major R.E. : In unknown Arabia, Macmillan, London 1926.

Coke, Richard : The Arabs' Place in the Sun, London, 1939.

Coke, Richard : The Heart of the Middle East, London, 1950.

Constitutional Documents of Saudi Arabia to Hejaz, London, 1926.

Coon Carleton Stevens,
Carvan : "The Nomads" P-23-42 in Sydney Nettleton Fisher (ed.) Social Forces in the Middle East. Ithaca, Corneth U.P. 1955.

Coon Carleton Stevens,
Carvan : The Story of the Middle East, New York, Molt, 1951.

Devid, Howarth : The Desert King, London, 1964.

De Gaury, Gearl: Arabia Phoenix, London, 1946.

Dickson, H.R.P. : Kuwait and Her Neighbours, London, 1957.

Dickson, H.R.P. : Life in Kuwait & Saudi Arabia, London, 1948.

Dickson, H.R.P. : The Arab of the Desert, London, 1983.

Doughty (Charles M.) : Arabia Deserta, London, 1936.

Doughty (Charles M.) : Arabian Journey, Harrap, London, 1950.

Doughty (Charles M.) : Travels in Arabia Deserta, C.U.P. 1888, New York, 1948.

Eddy, William, F.D.R. : Meets Ibn Saud, New York, 1954.

Eden. Anthony : Full Circle London, 1960.

Espasito John L.
(Edited) : Isiam and Development, Syracuse University Press,

Dhaka University Institutional Repository

New York, 1980.

Fisher, SN. ed. : Evaluation in the Middle East: Revolted change, London 1953.

Fisher, W.B. : The Middle East: A Physical Social and Geography, London, 1950.

Fouad Al-Farsy : Modernity and Tradition, London, 1992.

Freeman-Grenville, G.S.P. : The Muslim and Christian Calendars, 2nd Ed. London, 1977.

Frood, a. Mekie : Recent Economic and Social in Saudi Arabia, Riyadh, 1939.

Gaury, Gearld De : Arabia Phoenix. London, 1946.

Gaury, Gearld De : Rulers of Mecca, London, 1951.

Glubb, Sir John Bagot : War in the Desert, London, 1960.

Graves, Robert : Great Britain and East, "Saudi Arabia and Egypt", London, 1936.

Graves, Robert : Lawrence in the Arabs, London, 1928.

Habib Johns, : Ibn Sauds Warriors of Islam, Netherlands, 1978.

Halliday Fred : Arabia without Sultan, New Zealand, 1974.

Harold Stevens

John (Ed) : Bibliography of Saudi Arabia.

Harrison, Paul W. : The Arab at Home, New York, 1924.

Horgarth, D.G. : History of Arabia, London, 1909.

Horgarth, D.G. : The Penetration of Arabia, London, 1904.

Huart : Historie des Arabes, French, 1919.

Hughes : Dictionary of Islam and Wahabis.

Dhaka University Institutional Repository

Hurgronje, c.Snouck : Mekka, London, 1929.

Hurgronje, c.Snouck : Revolt in Arabia. London, 1939.

Dr. Sheik Mohammad Iqbal : Saudi Arabia its foundations Development, Kashmir, 1989.

Iqbal, Dr. Sheik Mohammad : Saudi Arabia, Kashmir, 1986.

Jacob, H.F. : Kings of Arabia, London, 1923.

Jacques Benoist : Arabian Destiny, London, 1957.

K.J.b. : Fortier Negotiations and Saudi Ambitions, USA Michigan, 1963.

Kammerer, a. : Transjordania et L' Arabia.

Kellly J.B. : Arabia, the Gulf and the War, New York, 1980.

Kenneth William, : Prince of Arabia, London, 1959.

Kostiner : Making of Saudi Arabia 1916-1936, From Chieftancy to Monarchical State.

Lackner Helen : A house Built on Sand a political economy of Saudi Arabia, London, 1977.

Lacey Robert : The Kingdom, London, 1981.

Lawrence, T.E. : Revolt in the Desert.

Leather Dale Clive : Britain and Saudi Arabia, London, 1985.

Lewis Bernard : Islam in History, Open Curt Publishing Company, Chicago and La Salle, Illinois USA, 1993.

Lipsky George A. : Preface to Doughboy's Arabia Deserta, London, 1936.

Lipsky George A. : Survey of World Cutara Saudi Arabia, London, 1959.

Masri, Abdullah M. : Saudi Arabia Antiquities Riyadh, Departmental of

Dhaka University Institutional Repository

Antiquities & Museums Ministry of Education, 1975.

MC. Gregor, R. : Saudi Arabia: Population and the Making of a Modern State, London, 1972.

Meulen, D. Vander : The Wells of Ibn Saud, London, 1957.

Mohammad Iqbal : Emergence of Saudi Arabia, Kashmir, 1977.

Mopwood, Derek : The Arabian Peninsula, London, 1972.

Musil, Alois : Arabia Deserta, London, 1938.

Musil, Alois : Northern Nejd, Oriental Exploration and Studies, No. 5, New York, 1927.

Nilblock Tim (ed) : State, Society and Economy in Saudi Arabia, London 1985.

Palgrave, William Gifford : Central and Eastern Arabia, 2 vols, London 65.

Philby, H. St. J.B. : A Pilgrim in Arabia, London, 1946.

Philby, H. St. J.B. : Arabian Jubilee, London, 1952.

Philby, H. St. J.B : Saddia Arabia, London, 1930.

Philby, H. St. J.B. : Saudi Arabia of the Wahabis, London, 1928.

Philby, H. St. J.B. : Saudi Arabia, London, 1955.

Philby, H. St. J.B. : Saudi Arabian Days, London, 1948.

Philby, H. St. J.B. : The Arab of the Desert, London, 1945.

Philby, H. St. J.B. : The Empty Quarter, New York, 1933.

Philby, H. St. J.B. : The Heart of Arabia, London, 1922.

Powell, E. Alexander : The Struggle for power in Muslem Arabia. N.D.

Rashid Ibrahim al (ed) : Documents on the History of Saudi Arabia, 3 Vols.

Raunkiaer B. : Through Wahabiland on Camelback, French, 1968.

Rihani, Aminal : Arabian Peak and Desert, London, 1928.

Dhaka University Institutional Repository

Rihani, Aminal : Around the Coasts of Arabia, Londan, 1930.

Rihani, Aminal : Ibn Saud of Arabia, London, 1928.

Rihani, Aminal : Maker of Modern Arabia, New York, 1928.

Royal Institute of International : The Middle East, Apolitical and Economical Survey, Oxford, London, 1958.

Vol-1 : The Unification of Central Arabia under Ibn Saud, 1909-1925.

Vol-2 : The Consolidation of Power in Central Arabia Under IBN Saud, 1925-1928.

Vol-3 : Establishment of the Kingdom of Saudi Arabia Under Ibn Saud, 1928-1935.

Rutter Eldon : The Holy Cities of Arabia, London, 192.

Sanger, Richard M. : The Arabian Peninsula, New York, 1954.

Sharf, Dr. Abdel : Aziz M. Abdel, Aziz Al Saud, Cairo, 1982.

Sluglett Peter and Marion Farouk : The Precarious Monarchy, London, 1969.

Stacey, T.C. et al : The Kingdom of Saudi Arabia, 3rd London, 1978.

Stark, Freega : The Southern Gates of Arabia, London, 1936.

Thomas, Bertram : Arabia Feliex, London, 1938.

Troeller, Gray : The birth of Saudi Arabia: Britain and the Rise of the House of Saud, London, 1976.

Tuson & Burdett (Ed.) : Records of Saudi Arabia, 1902-1960, Archive Edns. 10. V.

Wahbah, Sheikh, Hafiz : Arabian days, London, 1960.

Wahban, Sheikh, Hafiz : Jazirat e Arab, Egypt, 1387 A.H.

Dhaka University Institutional Repository

Weintraub, Stanley &

Rodelle : Evaluation of revolt, Early Post War, London, 1968.

Wenner. M.W. : Saudi Arabia Cambridge, 1975.

Williams Kenneth : Ibn Saud, London, 1933.

Zwemer, S.M. : Arabia: The Cradle of Islam, London, 1986.